মেনকারাণী

গার্হস্থ্য-উপন্যাস

শ্রীতারকনাথ সাধু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
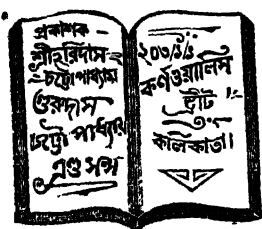
আশ্বিন—১৩৩০

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপহার
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে, সাদরে অর্পিত
হইল।
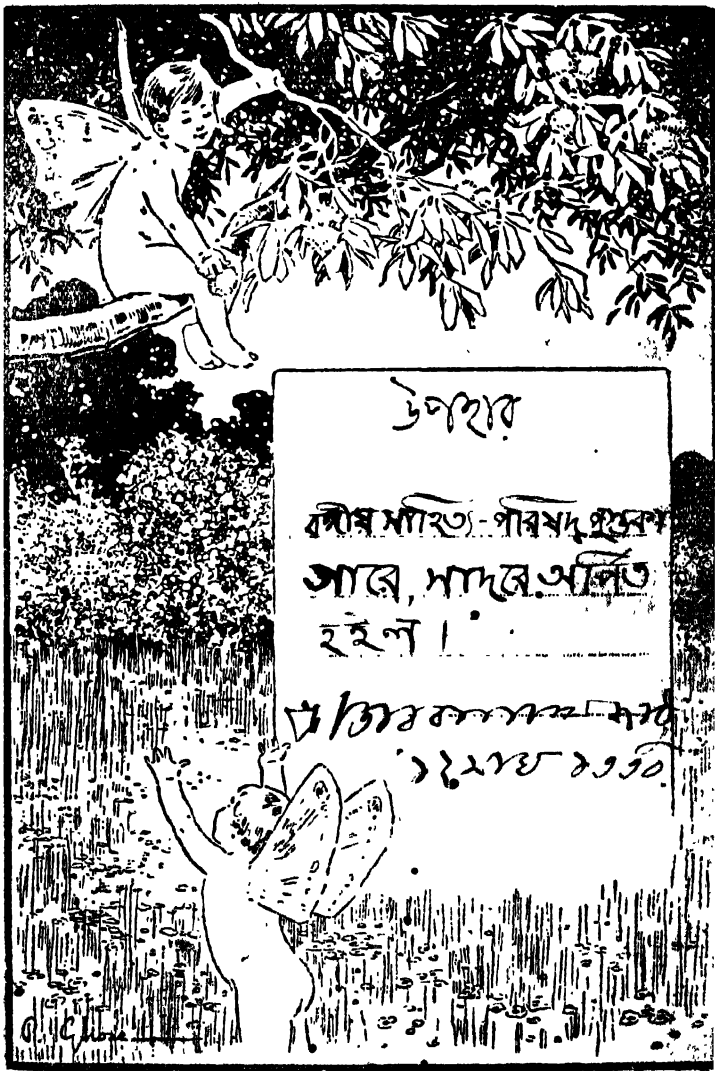
গ্রন্থাভাষ

সাধারণতঃ পুরুষ রমণীকে অবলা বলিয়াই ব্যাখ্যান করেন—ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক—নারী কখনই অবলা নহেন, কোন অবস্থাতেই নহেন। নারী শক্তিস্বরূপা ও সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রবলা, তিনি সকল শক্তির আধার। পুরুষ নারীর হস্তে ময়দার তাল মাত্র—এই ময়দার তালকে বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তিস্বরূপিনী রমণী আপন হস্তে লইয়া যেমন ইচ্ছা ঠিক সেইরূপ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া লন। পুরুষও সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্ব অবস্থায় নিজের নিজস্ব ত্যাগ করিয়া ভেঙ্গে চুরে রমণীর হাতে তদীয় ইচ্ছামত গঠিত হইতে প্রস্তুত, উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব। তবে সব সময়ে যে পুরুষ রমণীর ইচ্ছামত সুগঠিত হয় না তাহার প্রধান কারণ রমণী, সকল সময়ে তেমন প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন না—কিন্তু করিলে আর রক্ষা নাই। রমণী ইচ্ছা করিলে পুরুষকে দানব করিতে পারেন আবার দেবতাও গড়িতে পারেন।

আমার পূর্ব্বগ্রন্থ "ভোলানাথের ভুল'এ এই ধ্রুব সত্যটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, অধর্ম্মার্জ্জিত ধনে কুবের হইলেও শিষ্টা স্ত্রীরত্নের অভাবে, দুষ্টা রমণীর হস্তে পড়িয়া মানবজীবন কণ্টকময় হয় "সুখ ধনে নয়, সুখ স্ত্রীরত্নে।"

আমার এই গ্রন্থ "মেনকারাণীতে"তে এই সত্য নির্য্যাসটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, শিষ্টারমণী পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইলে তাহার অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, সুখ শান্তির ইয়ত্তা থাকে না; "সুখ ধনে নয় সুখ মনে।" ইহাতে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠক পাঠিকাগণের রায়ের উপর নির্ভর। ইতি ১৯শে চৈত্র ১৩২৯ সাল।

সাধু সঙ্ঘ,
মধুপুর,

শ্রীতারকনাথ সাধু

মৈনীকারাণী

১

স্বর্গ কোথায় ?

রামচন্দ্র বাচস্পতি গোপালপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁহার নাম ও যশঃ ভারতের সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার টোলে দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ ব্যাকরণ ও ন্যায় পড়িবার জন্য আসিত।

গোপালপুর বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহা ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। সেই গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও গন্ধবণিক্—তন্মধ্যে অনেকেরই অবস্থা মন্দ নহে। তাঁহাদিগকে ধনবান্ বলিতে পারা যায় না, তবে সংসারে তাঁহাদের বিশেষ কোন দুঃখ বা অভাব আছে বলিয়া বোধ হইত না।

এক সময়ে এই গ্রামে অনেকগুলি টোল ছিল। এখন কেবল মাত্র দুইটী টোল বিদ্যমান আছে। স্থায়িত্বই যোগ্যতার পরিচায়ক। একটী রামচন্দ্র বাচস্পতি পণ্ডিতের; অপরটী, কামাখ্যাচরণ বিদ্যাবাগীশের। এতদ্ভিন্ন দুইটী স্কুল, একটী এম, ভি, অপরটী এম, ই। আর মিশনারী-দের স্থাপিত একটী বালিকা-বিদ্যালয়ও আছে।

মেনকারাণী

বাচস্পতি-গৃহিনী উমাদেবী, নামেও উমা কাজেও উমা—নামে ও কাজে অনুপমা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

উমাদেবীর পুত্র সন্তান হয় নাই, একমাত্র কন্যারত্ন, নাম মেনকারাণী। ভাল গাছের ফল সংখ্যায় অধিক জন্মে না; জগতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না; বাচস্পতি মহাশয়ের সন্তান সন্ততির মধ্যে এক কন্যা মেনকারাণী; আর সেই কন্যা পিতার নয়নানন্দদায়িনী ও মাতার জীবন-সর্ব্বস্বা। হইবে না বা কেন? পুত্র ও কন্যা কি পৃথক্? পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক, মাতাপিতার পক্ষে দুই সমান। তবে পুত্র পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করে, বংশের নাম রাখে এবং পূর্ব্বপুরুষদিগকে পিণ্ড দান করে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই পিতা পুত্র পুত্র বলিয়া অধীর হয়েন। আর কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া উঠে, বিশেষতঃ অর্থহীন ভদ্রলোকের। তাই কন্যার নামে প্রাণে আঘাত পান। কিন্তু মাতাপিতার পুত্র ও কন্যা দুই সমান—অপত্য স্নেহের নিকট পুত্র কন্যার পার্থক্য নাই।

বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পত্নী উমারাণী উভয়েই এই মেনকাকে পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের মনে কোনরূপ ক্ষোভের উদয় হয় নাই। বরং কেহ যদি বাচস্পতি মহাশয়কে পুত্রাভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন, অমনি বাচস্পতি মহাশয় সগর্ব্বে বলিতেন, "আমার আবার পুত্রের অভাব কি? যাঁহার টোলে এত সুন্দর সুন্দর বুদ্ধিমান্ ছাত্র আছে, তাঁহার আর পুত্রের অভাব কি?" এই বলিয়া ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দিতেন; আর বলিতেন, "আমার উপর এতগুলি পুত্রের বিদ্যা-দানের ভার আছে, আমি যদি সকলকে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারি,

তাহা হইলেই ত পিতৃকার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে করা হইল। আর যদি সেই কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিতে না পারি, তবে আমার অন্য পুত্রের পিতা হইবার অধিকার নাই।” এই বলিতে বলিতে বাচস্পতি মহাশয়ের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। ইহাকেই বলে গুরু। আর এরূপ গুরুকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে কে? সেই জন্যই আমাদের দেশে গুরুভক্তির কথা পুরাণাদিতে পাঠ করিতে পাই। নচেৎ বিদ্যালয়ে ২।৩ ঘণ্টা কালমাত্র বেত্রাঘাতের সহিত যে গুরুর সম্পর্ক শেষ হয়, তাঁহার ভক্তি উদ্রেক করাইবার জন্য বেত্রাঘাতেরই প্রয়োজন হয়।

পুন্নাম নরকের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে বাচস্পতি মহাশয় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, “কেন, মেনকার গর্ভজাত পুত্রও ত পিণ্ডের অধিকারী। কেবল বংশের নাম রাখিবার জন্য আবার পুত্রের প্রয়োজন কি? সুপুত্র না হইলে ত আর বংশের নাম থাকে না। আর সুকন্যা হইতেও বংশের নাম উজ্জ্বল হয়। আর আমার নাম আমার শিষ্যগণই রাখিবে। তবে এ সমস্তই আমার নিজ অধ্যবসায় ও শিক্ষা প্রদানের উপর নির্ভর করিতেছে। সে শিক্ষক শিক্ষকই নহেন, যাঁহার ছাত্র শিক্ষকের নাম রাখিতে পারে না; আর সে গুরু গুরুই নন, যিনি ছাত্রগণকে মানুষ করিয়া তুলিতে না পারেন। গুরুর উপরই শিষ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। ভগবান্ করুন, আমি যেন শিষ্যগণকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারি; তাহা হইলে আমার আর পুত্রের অভাব কি?”

উমাদেবী কিন্তু মেনকারাণীকে পাইয়া বিভোরা; পুত্রের কথা তিনি একবারও মুখে আনিতেন না এবং কেহ পুত্রের কথা বলিলে, তিনি এই কথা বলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন—“এত বড় বসুন্ধরা এক

চন্দ্রের দ্বারা সুশোভিত; এত বড় জগৎ এক ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, আর এক বিষ্ণু কর্ত্তৃক পালিত হইতেছে। তবে আমার এই মেনকারাণী কি আমাকে সর্ব্ব সুখে সুখী করিতে পারিবে না? আর সেই সুখের প্রার্থীও ত আমি একা! একা মেনকা কি আর আমাকে সুখী করিতে পারিবে না? যদি ভাগ্যে বিধাতা সুখ লিখিয়া থাকেন, তবে এই মেনকারাণী হইতেই হইবে, নতুবা শত পুত্রের জননী হইয়াও সুখী হইতে পারিব না। আর লোকে পুত্র কন্যা চায় লালন পালনের জন্য। কিরূপে তাহারা এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় বর্দ্ধিত হইতেছে, ক্রমে কিরূপভাবে তাহাদের বৃত্তিগুলি বিকাশ পাইতেছে, সেই সব পর্য্যালোচনা করিবার জন্য। তাহা আমার ত' সব আছে; আমাদের টোলের এতগুলি বালককে মানুষ করিবার ভার আমাদের উপর—এতবড় কার্য্য আমাদের সম্মুখে, তবে তাহারা আমাদের ঔরসজাত পুত্র নয়; তাহাতে কি বহিয়া গেল। ভগবান আমাদের মনে বল দিন, আমরা যেন এতগুলি পুত্র ও এক কন্যা মেনকাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারি। কেবল খাওয়াইলে পরাইলেই মানুষ হয় না—মানুষের মত মানুষ করিতে হইবে, প্রত্যেকের মনোবৃত্তির যাহাতে সম্যক্ বিকাশ হয়, তাহাই করিতে হইবে। আর বল ত আমার মেনকাই একা একশত। মেনকা বেঁচে থাকুক, আমাদের আর সুখের অভাব কি?"

এইরূপে বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী উমারাণী টোলের ছাত্রগণের সঙ্গে সঙ্গে মেনকারাণীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া উভয়েই এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। আত্মপ্রসাদই স্বর্গ, আত্মগ্লানিই নরক। সৎকর্ম্মের ফল,

আত্মপ্রসাদ, আর মন্দ কর্ম্মের ফল আত্মগ্লানি। যদি স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে চাও, তবে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন কর, এই পৃথিবীই তোমার পক্ষে স্বর্গ হইবে। জানি না, এতদ্ভিন্ন পৃথক্ স্বর্গ ও নরক আছে কি না।

এদিকে মেনকারাণী রূপে গুণে অসামান্যা হইয়া উঠিতে লাগিল। যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে। মেনকা গ্রামের বালক বালিকাদিগকে আপন ভ্রাতা বা ভগিনীর মত দেখিত। সেও যেমন সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখিত, তাহারাও তেমনই প্রাণের সহিত মেনকাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, ভালবাসিত। আর টোলের ছাত্রগণের ত কথাই নাই। মেনকাকে সকলেই প্রাণপণে সুখে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিত। আর তাহার আদেশ ভৃত্যের ন্যায় পালন করিত। ঘাত প্রতিঘাতের অমোঘ ও অব্যর্থ নিয়মানুসারে পাড়ার সকল বালক বালিকাই মেনকাকে দেখিলে আনন্দে অধীর হইত এবং তাহাকে পরম আত্মীয়া মনে করিত।

এ দিকে মাতা ও পিতার যত্নে মেনকা সকল বিষয়েই সুশিক্ষা পাইতে লাগিল। সত্বরই বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় মেনকার বেশ ব্যুৎপত্তি হইয়া উঠিল; আবার উমার শিক্ষাগুণে রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে মেনকা সুদক্ষা হইয়া উঠিল, আর সীবনাদি কারুকার্য্যেও তাহার মত সুদক্ষা বালিকা দেখা যাইত না। কে জানে কি কুহক-বলে—মেনকা সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা ও সর্ব্ব বিষয়ে সুদক্ষা হইয়া উঠিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন দিন দিন মেনকার রূপরাশিও উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

অধুনা আমরা সুশিক্ষিতা নারী বলিলে বুঝি, তিনি সদাই ফিট্‌ফাট্, ফুলকুমারীর মত সাজ সজ্জায় বিভূষিতা, নবেল নাটক পাঠে সুদক্ষা, ও

নিত্য ভূরি ভূরি ভাল মন্দ ও চলনসই পদ্য রচনায় ব্যতিব্যস্তা, আর সংসারের কাজ চাকর চাকরাণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তা।

কিন্তু সুখের বিষয়, মেনকার শিক্ষা সেরূপ হয় নাই। তাহার শিক্ষা যথার্থ শিক্ষাপদবাচ্য। সেই জন্য একদিন কামাখ্যাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মেনকারাণীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

বাচস্পতিঃ পিতা যস্যাঃ মাতাচৈব উমাসতী।
ধন্যা সা মেনকারাণী বরাঙ্গনা মহীতলে॥
মুক্তহস্তা সদা দানে সুদক্ষা দেব-পূজনে।
রন্ধনে সিদ্ধহস্তা যা ক্ষিপ্রা চ পরিবেষণে॥

এহেন মেনকারাণী যাহার গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছিল,—তাহার গৃহ স্বর্গ নহে ত কি? ইংরাজেরা বলেন, তাঁহাদের আবাসবাটী তাঁহাদের দুর্গ, আর আমরা বলি আমাদের আবাসবাটী আমাদের নিজস্ব—আমাদের স্বর্গ—আর সুশিক্ষিতা রমণী সেই স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রমণীকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে গঠন করিতে যে যে শিক্ষার প্রয়োজন, মেনকারাণী সেই সমস্ত শিক্ষাই মাতাপিতার হস্তে পাইয়াছিলেন। দীনে দয়া, গুরুজনে ভক্তি, ভগবানে অচল বিশ্বাস, অক্লান্ত ভাবে নর-নারায়ণের সেবা, সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান ইত্যাদি তাহার শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল। তিনি শিখিয়াছিলেন, কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না, কাহারও মনে কষ্ট দিবে না, যথাশক্তি পরোপকারে রতা থাকিবে, সদা নর-নারায়ণের সেবা করিবে। তিনি শিখিয়াছিলেন, এ পৃথিবী পরীক্ষার স্থান, নরনারায়ণের দুঃখ-মোচন ভগবানের বিশেষ অভিপ্রেত। প্রাণপণে আত্মীয় স্বজনের সেবা শুশ্রূষা ও অভাব মোচন করা এবং মানব

মাত্রেরই কুশল চিন্তা ও যথাশক্তি উপকার করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। আর মেনকার পিতা মেনকাকে শিখাইয়াছিলেন, শুধু চিন্তা ও সদিচ্ছায় কাহারও উপকার সাধন হয় না, মানবপুঞ্জের ত দূরের কথা। চিন্তা বা ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, ঘরে বসিয়া বা বাহিরে পাঁচের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চীৎকার করিলেই মানব-সমাজের উন্নতি করা হয় না। ইহা কর উহা কর, ইহা করা উচিত, উহা করা উচিত, বলিয়া চীৎকার করিলে কিছুই হয় না! হাতে হেতেরে কাজ করিয়া আত্মীয় স্বজনের ও মানবপুঞ্জের উপকার করিতে হইবে, নিজের কার্য্য বক্তৃতায় পরিসমাপ্তি করিয়া অপরকে কর্ম্ম করিবার আদেশ কখনও সুফল প্রসব করে নাই। ইচ্ছা কার্য্য নহে—ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ইচ্ছা ও ইচ্ছার জ্ঞাপন কিছুই নহে—যদি সে ইচ্ছা ও ইচ্ছার জ্ঞাপন কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা যায়। তাই মেনকার মাতাপিতা উভয়েই মনের সাধে কন্যাকে কার্য্যকরী শিক্ষাই দিয়াছিলেন।—তাঁহারা বলিতেন কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্মই মনুষ্যের মোক্ষের একমাত্র উপায়। সৎকার্য্যের গবেষণা ভাল। কিন্তু সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত না হইলে, তাহার মূল্য কিছুই নাই, তাহা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর।

তাই বাচস্পতি মহাশয় প্রত্যেক দিন প্রতি কার্য্যে ও প্রতি কথায় দেখিতেন, তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে কি না। আর উমারাণী সোৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন, তাঁহার মেনকা তাঁহাদের ইচ্ছানত গঠিতা হইতেছে কি না; যখন তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাটী যাইবে, সেখানে গিয়া কেবল নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, দেব দ্বিজে ভক্তি,

আত্মীয়স্বজনের সুখ শান্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, স্বামীকে আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে করিতে সংসারের সুখ বর্দ্ধন করিয়া, আপন সুখময় জীবনের পূর্ণাদর্শ জগতে দেখাইতে দেখাইতে নারী জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে কি না। উমাদেবী আরো ভাবিতেন, যদি তাঁহাদের কন্যা এ সমুদায় গৃহকর্ম্মে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বিফলমনোরথ হন, তবে সে দোষ তাঁহার। যিনি শুদ্ধ গর্ভে ধারণ করিয়া মাতৃ-নামের সার্থকতা না করিয়া প্রতি কার্য্যে ও প্রতিপদে কন্যাকে আদর্শ-স্থানীয়া রমণীশ্রেষ্ঠা করিয়া তুলিতে না পারেন, তিনি মাতা নামের যোগ্য নন।

এইরূপ কার্য্যকলাপের মধ্যেই মেনকারাণী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা পিতার সুখের সীমা নাই। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন,—স্বর্গ কোথায়, আকাশে না এই মর্ত্তীতলে?

২

"চিন্তা জ্বরঃ মনুষ্যাণাম্।"

দেখিতে দেখিতে শশিকলার ন্যায় মেনকারাণী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুখে দুঃখে মেনকারাণী এ জগতে দশবৎসর ব্যাপিয়া তাহার মাতাপিতার জীবনসুখ বর্দ্ধন করিয়া তাহাদের সুখদুঃখময় জীবনাকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন স্থায়ী হইল না, তাহাদের জীবনের সুখস্রোত হঠাৎ বাধা প্রাপ্ত হইল—এক ভাবনা আসিয়া জুটিল। ভাবনার আগমনে সুখের খরস্রোত দিন দিন মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। বাচস্পতি মহাশয় বিপুল ধনশালী ছিলেন না সত্য, কিন্তু সে কারণে তাঁহার সুখের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে মেনকাকে লইয়া বেশ মনের সুখেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। যদিও তাঁহার তত ধনৈশ্বর্য্য ছিল না, তবে তাঁহার কোন বিশেষ অভাবও ছিল না। এ জগতে যাহার অভাব নাই, সেই প্রকৃত সুখী, যত দিন মানুষের অভাব না হয়, তত দিন মানুষ উন্নত-মস্তকে চলিতে পারে, তাহাকে মস্তক নত করিতে হয় না। যেমন মানুষের অভাব বোধ হয়, অমনি তাহার চির উন্নত মস্তক ঝুঁকিয়া পড়ে; অমনি তাহার সুখের তরী সেই সময়ের মত দুঃখ সাগরে ডুবিয়া যায়। সকল মানুষের যাহা হয়, বাচস্পতি মহাশয়েরও তাহাই হইল। যত দিন মানুষ

অভাবরূপ বিপদে না পড়ে, তত দিন সে অভাবের আক্রমণ-ক্ষমতা বুঝিতে পারে না। তত দিন সে ভাবে—রাম, শ্যাম, হরি ও যদুর বিপদ হইয়াছিল, আর তাহারা বিপদে অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমার সে বিপদ হইবে না, অথবা হইলেও আমি কখনই অধীর হইব না। কন্যা নয়নানন্দময়ী ও জীবনানন্দবর্দ্ধিনী সত্য। কিন্তু সেই কন্যাই আবার যখন বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠে, সেই সময়ে সে পিতা মাতার জীবনকে নিরানন্দময় ও দুঃখময় করিয়া তোলে।

প্রত্যেক কন্যারই বিবাহ হয়। বিশেষ হিন্দুকন্যার। ইহা ধ্রুব সত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি যত দিন না দুই হাত এক হয়, তত দিন বাপমায়ের দুঃখ-কষ্টের অবধি থাকে না, বিশেষতঃ বাপমার যদি তেমন ধনসম্পত্তি না থাকে। এখনকার দিনে বরের পিতা চাহেন নিখুঁত সুন্দরী কন্যা, আর তাহার সহিত বিপুল ধনসম্পত্তি। পুত্র যাহাই হউক না কেন,—হউক মূর্খ, হউক কুৎসিত, হউক কদাচারী, হউক সর্ব্বগুণহীন,—বরকর্ত্তা চান, তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ হবেন সর্ব্বগুণ-সম্পন্না, সর্ব্বরূপের আধার এবং ধনৈশ্বর্য্যের অফুরন্ত আকর। এরূপ গুণাবলী না থাকিলে, তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী নন। হয় ত তিনি যেসব দ্রব্যসামগ্রী ভাবী বৈবাহিকের নিকট হইতে সহাস্যবদনে চাহিতেছেন, তাহা পাইলে তৎসমস্ত রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাতে ক্ষতি কি? এহেন সর্ব্বরূপাধার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর সুখে থাকিবার ঘর এখন তাঁহার নাই সত্য, তাতেই বা কি আসে যায়? শ্বশুরালয়ে আসিয়াই বধূকে চাকরাণীর মত সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা উপায়ান্তর নাই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাঁহার পুত্র কদাকার; পুরুষ মানুষ কখনও কি কদাকার হয়? তাঁহার পুত্র গুণহীন; সে বিষয়ে

এখনও স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই, বয়সে গুণবান হইতে পারে। তাঁহার পুত্র মুর্খ; একেবারে বিদ্বান্ না হওয়া অপেক্ষা দেরীতে হওয়া ভাল, কালে পুত্র পণ্ডিত হইতে পারে। তাঁহার অর্থহীনতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা; তাহাতে কি যায় আসে? এককপর্দ্দকহীন ব্যক্তিও জগতে অনেক স্থলে কোটীশ্বর হইয়াছে। কে বলিতে পারে, তাঁহার পুত্র তাহাদের মধ্যে একজন নয়? আর তাঁহার পুত্র যদি সেই কোটীশ্বরই হন—যাহার খুব সম্ভাবনা আছে, আর সে বিষয়ে তাঁহার মন বলিতেছে যে, সে নিশ্চয়ই হইবে, মনই যে নারায়ণ—তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর সুখের অবধি থাকিবে না, তিনিও তখন আর তাঁহার ছেলের উপযুক্ত পণ বৈবাহিকের নিকট হইতে চাহিতে পারিবেন না, চাহিলেও বৈবাহিক মহাশয় পুনরায় দিবেন না, যদি দেন ত তাহা তাঁহার কন্যা ও জামাতারই থাকিবে, তাহাতে তাঁহার কি লাভ?

এখনকার সময়ে আমাদের সমাজে এইরূপ ভাবেই পুত্র কন্যার বিনিময় হয়। সকল দেশে সকল সময়ে দ্রব্যের গুণাগুণ অনুসারে মূল্য নিরূপণ হয়; তবে বররূপ দ্রব্যের মূল্য সেভাবে নিরূপিত হয় না। প্রত্যেক বাপের কাছে তাঁহার ছেলের দাম অমূল্য। তবে তিনি দয়া করিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ লইয়া বিনা মূল্যে তাঁহার পুত্ররত্ন লুটাইয়া দিতেছেন।

উমাদেবী কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাহার বিবাহের জন্য চিন্তিতা। প্রথম প্রথম যখন তিনি স্বামীর কাছে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিতেন, তখন তিনি হাসিয়াই সে কথা উড়াইয়া দিতেন, আর বলিতেন "মেনকা কচি মেয়ে, তাহার বিবাহের জন্য এত তাড়া কেন?" কিছুদিন এইরূপে কাটিল। এবার উমা মেনকার বিবাহের প্রস্তাব

করিলে বাচস্পতি মহাশয় আর হাসেন না। তাঁহার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করে। তিনি বলেন, "আমি ত চেষ্টা করিতেছি। চেষ্টার কিছু ক্রটি নাই। তবে, সব সময় চেষ্টাতেও কার্য্য সফল হয় না।" আর বলেন, "ব্রাহ্মণি, যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"। পূর্ব্বে যে সব কথা হাসির উপর হইতেছিল, ক্রমে সেই সব বিষয় ভাবনার জ্বরে জড়িত হইতে লাগিল। তবে ভাবিয়াও ত অভাবের মোচন হইল না। ক্রমে ভাবনা-জ্বর ১০৬ ডিক্রী পর্য্যন্ত হইল, প্রাণ যায় যায়। ঘটকরূপ বৈদ্য অনেক ঔষধের ব্যবস্থা আনিতে লাগিল বটে, কিন্তু অনুপান অভাবে ঔষধ পড়ে না। ঔষধ অভাবে জ্বর বিচ্ছেদ হয় না। হায় ভগবান! এ কি করিলে!

প্রথম প্রথম বাচস্পতি মহাশয় রূপে, গুণে, কুলে ও অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পাত্র খুঁজিতেছিলেন। তাহা ও পাইলেন না। তৎপরে পুরুষ মানুষের রূপের বিশেষ প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গুণে, কুলে ও অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পাত্র খুজিতে লাগিলেন। যখন তাহা পাওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িল, অর্থাৎ বিশেষ খুঁজিয়াও পাইলেন না, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, জামাতা আপাততঃ গুণবান্ না হইলেও ক্রমে গুণবান্ হইতে পারে। তখন তিনি কুল ও অবস্থা খুঁজিতে লাগিলেন। তাহাই কি ছাই শীঘ্র মেলে? যাহাই হউক বাচস্পতি মহাশয় বদ্ধপরিকর হইয়া জামাতা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অন্বেষণের ধূম বা কি! খালি দৌড়ধাপ্। তিনি দৌড়ান বা থামুন, বাটীতে আসিলেই গৃহিণীর কশাঘাত। পূর্ব্বে বাচস্পতি মহাশয় আহারে বসিলে গৃহিণী ব্যজনে ও নানা মধুর সম্ভাষণে তাঁহার জীবন উৎফুল্ল করিতেন ও ভোজনেও রুচির উদ্রেক করাইতেন। এখন ভোজনে বসিলে, ব্রাহ্মণীর পূর্ব্বের ন্যায়ই

হাতে পাখা আছে সত্য, কিন্তু সম্ভাষণ সেই একঘেয়ে "পাত্র ঠিক হ'ল, করিতেছ কি ?"

ক্রমাগত একঘেয়ে তাগাদায় ব্রাহ্মণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্ন তাঁহার আর উদরস্থ হয় না, গলার ছিদ্র সরু হইতে লাগিল; পাপী-তাপীর একমাত্র আশ্রয়-স্থল নিদ্রাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। সর্ব্ব বিপদের কাণ্ডারী, অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, সর্ব্বদুঃখবিনাশক বিপদ-ভঞ্জন, মধুসূদনের তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ডাকিতে লাগিলেন—"ভগবান, এ কি করিলে, এ বিপদে উদ্ধার কর, প্রভু।" প্রভু কিন্তু সকল সময়ে সকলের কথা শীঘ্র কানে তুলিলেন না।

বৈঠকে ও মজলিসে বসিয়া আমরা যেরূপভাবে পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষ-পর্য্যালোচনা ও গুণ-কীর্ত্তন করি, কার্য্যজগতে সেরূপভাবে অর্থহীন পাণ্ডিত্যের গুণগ্রাহী নহি। সেই জন্যই এই বিশেষ বিত্তহীন পণ্ডিত গুণী সদ্‌ব্রাহ্মণের সর্ব্বগুণসম্পন্না দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার সৎপাত্র-সংযোগ বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। যে সব স্থলে তিনি কখনও মস্তক নত করেন নাই, সেই সব স্থলে তাহাদের সম্মুখে আপন উন্নত মস্তক মাটীতে সংলগ্ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না, বরং মাথা নোয়ানই সার হইল। নিরবচ্ছিন্ন অর্থহীন গুণের আদর কেবল মানুষের মুখে, কার্য্যে নয়। মানুষের মুখের কথা একরূপ আর কার্য্য অন্যরূপ, উক্তি ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে দিন মৌখিক উক্তি ও কার্য্য (অভিব্যক্তি) একরূপ হইবে, সেদিন পৃথিবীর অনেক গোলযোগের অবসান হইবে।

একদিন দ্বিপ্রহরে বাচস্পতি মহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সম্মুখে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রক্ষিত। বাচস্পতি-গৃহিণী পাখাহস্তে ব্যজন করিতেছেন।

বাচস্পতি মহাশয় শনৈঃ শনৈঃ সম্মুখস্থ অন্নব্যঞ্জন কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদরস্থ করিয়াছেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণী বলিলেন, "হ্যাগো পাত্রের কি হইল? এত বড় দেশজুড়ে তোমার নাম, আর তোমারই কন্যার বর মিলিল না? তবে আমাদের মেনকা কি চিরকুমারী থাকিবে?"

বাচস্পতি। (অর্দ্ধ উত্তোলিত হাতের গ্রাস হাতেই রহিয়া গেল ; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) পাগলি, হিন্দুর মেয়ে কি কখন অবিবাহিতা থাকে? হিন্দুর মেয়ের বিবাহ স্থিরনিশ্চয়। তবে দুদিন অগ্রে বা দুদিন পশ্চাতে। আমার সোণার কমল মেনকা রূপে গুণে ধন্যা। তাহাকে কি যার তার হাতে দিতে পারি? কাজেই একটু চেষ্টা চরিত্র করিতেছি, উপযুক্ত পাত্র পাইলেই দুই হাত এক ক'রে দিব।

ব্রাহ্মণী। সে কথা ত শুনিতেছি, আজ এক বৎসরের উপর। বিধাতার লিখন কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ভবিতব্য তাহা ঘটিবেই। তবে এত খোঁজা কেন? একটু দেখিয়া শুনিয়া দুই হাত এক করিয়া দাও। দেখ, পাত্রটি যেন একটু দেখতে শুনতে ভাল হয়, তাহার মাতা পিতা যেন বর্ত্তমান থাকে, আর তাদের কিঞ্চিৎ ধন সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলেই হইল। যদ্যপি বিদ্বান্ না হয়, তা'তে কিছু আসে যায় না। মেনকা আমার যেরূপ মেধাবিনী, সে তার স্বামীকে মনের মতন গড়িয়া লইতে পারিবে। আর অনেকে একটু বয়স হইলেও ত লেখাপড়া শিখে। দেখ, লোকে যে জায়গায় একটী গরু বাঁধে, তখন দেখে সেখানে ঘাস জল আছে কি না। আর তুমি মেয়ে দিবে, দেখবে না যে বরের বাপের অবস্থা ভাল কি না? বর যদি সুশ্রী হয় ও তার বাপের অবস্থা ভাল হয়, সেখানে কন্যা অনায়াসেই সম্প্রদান করা যায়।

বাচস্পতি। ব্রাহ্মণি, তুমি যা বলিতেছ তাহা সবই সত্য। তবে কি জান, আমার কন্যা মূর্খ বরের হাতে পড়িবে, তাহা কিরূপে হইতে পারে ?

ব্রাহ্মণী। তা বটে। আর লোকেই বা বলিবে কি ?

বাচস্পতি। তোমার "লোকেই বা কি বলিবে," এর জন্য আমি ততটা উদ্বিগ্ন নই। লোক মাত্রই ভবিষ্যৎবক্তা। যদি ভাল হয়, ত বলিবে আমি ত বলিয়াছিলাম এইরূপ হইবে। আর যদি মন্দ হয়, তখনও বলিবে, আমি ত বলিয়াছিলাম, এইরূপ হইবে। আমার মেনকার সুখ দুঃখের জন্য তাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না; তবে তারা যে প্রত্যেকে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা মেনকার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী, ইহা বুঝাইতেই ব্যস্ত। যতক্ষণ বৈঠকে বসিয়া মেনকা সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে, ততক্ষণই তাহারা আমাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুখী। বৈঠক ভাঙ্গিলে আর আমাদের জন্য তাদের কোন দায়িত্ব নাই। যখন তাদের অন্য কোন কাজ নাই, তখন তারা আমাদের এই বিপদে বিশেষ সহানুভূতি করিতে উদ্যত। বাস্তবিক কিন্তু আমাদের এই অবস্থায় তাদের বিশেষ ইষ্টানিষ্ট নাই। তবে যে, সময়ে সময়ে মৌখিক 'আহা আহা' করে, তাহা কেবল তাদের আত্ম-শ্লাঘার রূপান্তর মাত্র। তারা বুঝাইতে চায়, দেখ, তাদের উপযুক্তা কন্যার জন্য বরান্বেষণে কষ্ট নাই, কিম্বা যদি সেটি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেই মুস্কিল হইতে এখন যে তাহারা আসান পাইয়াছে। অতএব তাহারা আমাদের অপেক্ষা সুখী। নতুবা এরূপ স্থলে 'আহা আহা'র অন্য কি অর্থ হইতে পারে ? যিনি যথার্থ দুঃখে দুঃখী, তিনি বরান্বেষণ

করিয়া বন্ধুর কাজ করিবেন, শুধু মুখে 'আহা' 'আহা' করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবেন কেন ?

ব্রাহ্মণী। তা যাই হোক্, একটা কিছু উপায় কর।

বাচস্পতি। ব্রাহ্মণি, আরও বিশেষ মুস্কিল কি জান ; আমরা বিত্তহীন, আজ কাল যে দিনকাল পড়েছে, অর্থহীনতা সর্ব্ব অনর্থের মূল। বিশেষ যৌতুক-শূন্যা কন্যা কে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে চায় ? এখন কুল, গুণ ও মনুষ্যত্বের নিকট তত আদর নাই, যত অর্থের। অর্থ থাকিলে কুল, গুণ ও মনুষ্যত্বের অভাব পূরণ করিয়া দেয়। তাহা না হইলে আমার মেনকা রাজরাণী না হইলেও রাজরাণী হইবার কোনরূপে অনুপযুক্তা নয়। যে তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবে, সে তারই গৃহ আলোকিত ও সুশোভিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ সত্ত্বেও আমরা তাহার বরের জন্য এত কষ্ট পাইতেছি কেন ? দেখ ব্রাহ্মণি, আসল কথাটা হ'চ্ছে, যত দিন আমরা চাল, ডাল, গরু, ছাগলের মত পুত্র কন্যাকে বেচাকেনার জিনিস মনে করিব, তত দিন আমাদের এরূপ অবস্থাই হইবে। লোকে বোঝে না, যদি এক পয়সা না লইয়াও একটি ভাল বৌ ঘরে আসে, তাহার মূল্য লক্ষ টাকা। আর যদি লক্ষ টাকা লইয়াও এক খারাপ বৌ ঘরে আনে—যার মনে দয়া নাই, ধর্ম্মভাব নাই, দেব-দ্বিজে ও গুরুজনে ভক্তি নাই, আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা নাই, সেরূপ বধূ সংসারে আসিলে, যদিও টাকার ভার লইয়া আসিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের রাশি, অশান্তির রাশি বাড়ীতে আনিয়া দিল। শুধু রাঙ্গা সূতা ও চেলির শাড়ী লইয়া ভাল কন্যা আনা, ওরূপ বধূ আনয়ন করা অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। আমরা ধন্য হই না ধনে, ধন্য হই গুণে। যত দিন সমাজ সে কথা ভাল করিয়া না বুঝে, তত দিন আমাদের সোণার কন্যারা

লক্ষ্মীছাড়াদের হাতে পড়িবে, আর লক্ষ্মীছাড়া মেয়েরা সোণার ছেলেদের হাতে পড়িবে। ব্রাহ্মণি, দুঃখ যে সমাজ এ কথা বোঝে না। পয়সা লইয়া বধূ আসিলে বলিতে ভাল আর দেখিতেও ভাল, কিন্তু সেই বধূ যদি গুণবতী না হয়, তবে অবশেষে সেই বধূই সংসারে সকল দুঃখের আকর হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণী। দেখ, তুমি সেদিন ভট্টপল্লীর যাদব শিরোমণির পুত্রের কথা বলিতেছিলে। তাহার কি হইল ?

বাচস্পতি। শিরোমণি মহাশয় অতি অমায়িক লোক, ঘরও করণীয়। পাণ্ডিত্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। কুল হিসাবেও তিনি বিশেষ উচ্চ-বংশীয়। আর্থিক অবস্থাও ভাল। তবে কি জান, ব্রাহ্মণি, তাঁহার বংশতিলকটি একেবারেই মা সরস্বতীর ত্যাজ্যপুত্র। শাস্ত্র-বিষয়ে তাহার একেবারেই অনাস্থা। সরস্বতী যে পথ দিয়া চলেন, তাঁহার পুত্রটি সে পথ দিয়া চলেন না। তবে দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়। আর শিরোমণি মহাশয় গুণগ্রাহী, বিশেষ অর্থলোলুপ নন। চেষ্টা করিলে সে পাত্রটি হইতে পারে। তবে কি জান, ব্রাহ্মণি, মূর্খ জামাতা, এই জন্যই ভয়। আমার বংশে—মূর্খ জামাতা!

ব্রাহ্মণী। কালিদাস কত বয়সে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন ?

বাচস্পতি। সকলেই ত আর কালিদাস হন না।

ব্রাহ্মণী। কালিদাস কিন্তু সকলের একজন; দেখ আমার কথা শোন, ঐ স্থানেই আমার মেনকার সম্বন্ধ স্থির কর। অনেক ত খুঁজিলে, ওর চেয়ে ত আর ভাল পেলে না। যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও। ঐ স্থানেই কথাবার্ত্তা স্থির কর। যে সব গুণ থাকৃলে ভাল জামাতা হয়, একটি ছাড়া আর সবই ত ঐ পাত্রে বিদ্যমান। আর কি করিবে, উপায়ান্তর

নাই। আমার মেনকার গুণ থাকে ঐ সে জামাতাকেই গড়িয়া লইবে।

বাচস্পতি। যা বল্‌ছ ব্রাহ্মণি সবই ঠিক, সবই সত্য। তবে কি জান, আমার কুলে মূর্খ জামাতা! মূর্খ জামাতা!

যাহা হউক এইরূপ কথোপকথনের চারি পাঁচ দিন পরে বাচস্পতি মহাশয় শুভদিন দেখিয়া ভট্টপল্লীতে যাত্রা করিলেন। শিরোমণি মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়কে আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন। বলিলেন "বাচস্পতি মহাশয়, আপনার সহিত কুটুম্বিতা, এত ভাগ্যের বিষয়। তবে কি জানেন, আমার পুত্রের শাস্ত্র শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ নাই। তাই ভাবিতেছিলাম, তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত কি না।" যাহা হউক অবশেষে স্থির হইল, তিনি মেনকাদেবীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবেন। পরে দিনও স্থির হইয়া গেল।

উমাদেবীর আর আনন্দের সীমা নাই। গ্রহণ হইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় আবার তাঁহার মুখ-জ্যোতিঃ পুনঃ বিকশিত হইল। এখন তিনি সদাই আনন্দময়ী। কিসে তাঁহার মেনকার বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, তিনি তাহা লইয়াই ব্যস্ত। এ ব্যস্ততা আনন্দময়ী, এ চিন্তা হাস্যময়ী। এ চিন্তায় ব্যথা নাই, এ চিন্তায় দহন নাই, এ চিন্তা কোমল ও সুখপ্রদ।

ভগবান্ মানুষকে কার্য্য করিতে পাঠাইয়াছেন। কার্য্যই মানুষের সুখের আকর, কার্য্যের ক্লেশ কষ্টদায়ক নয়, আনন্দবর্দ্ধক। কার্য্যের ক্লেশে কশাঘাত নাই। তবে যাহারা কার্য্য করিতে ভীত, তাহাদেরই যত বিপদ। তাহারা ভীতিবশতঃ সর্ব্বদাই মৃত, দিনে দশবার করিয়া মরিতেছে। উমাদেবী সে শ্রেণীর রমণী নহেন। যে শ্রেণীর রমণীরা কার্য্যকেই জীবনের

একমাত্র লক্ষ্য, অবলম্বন ও উদ্ধারের কেন্দ্র মনে করেন, উমাদেবী সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তা। স্বামীর প্রতি ভক্তি, স্বামীর সেবা, স্বামীর সুখস্বচ্ছন্দতা-বর্দ্ধন, স্বামীর গৃহকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ ও পুত্রকন্যা পালন, স্বামীর আত্মীয়গণের যথাযথ রক্ষণ ও পালন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। কার্য্যেই তাঁহার শরীর ও মনের পুষ্টিসাধন। অধুনাতন এক শ্রেণীর রমণীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের প্রধান ভয় কার্য্যে, তাঁহাদের ক্ষয় কার্য্যে, তাঁহাদের শরীর ও মনের বল ক্ষয় হয় কার্য্যে। কার্য্য দাসীর জন্য, ভদ্রমহিলার জন্য নয়। স্বামীর বাটীতে আসিয়া তাঁহারা কেবল স্বামীরই সহিত সম্পর্কটি বোঝেন, আর কেহ কিছুই নয়। তাঁদের একান্ত চিন্তা ও চেষ্টা স্বামীর উপর স্বামিত্ব স্থাপন। তাঁহারা স্বামীর বাটীতে আসিয়াই স্বামীর দাসদাসী ও আত্মীয়স্বজনের উপর হুকুম চালান ও প্রভুত্ব স্থাপন করেন; আর হুকুমের অপালনে তাঁহাদের সহিত সম্পর্কছেদন করিয়া বসেন। কার্য্য দাসদাসীর জন্য, তাঁহাদের জন্য নয়। তাঁহাদের স্বামী তাঁহাদিগকে গৃহে আনিয়া গৃহ পবিত্র করিয়াছেন, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ধন্য করিয়াছেন এবং নিজেকেও বরেণ্য করিয়াছেন। কার্য্যে বলক্ষয়, কার্য্যে দেহক্ষয়, কার্য্যে আয়ুক্ষয়, অতএব আত্মরক্ষার্থে তাঁহারা কার্য্য করিতে নারাজ। যদি কার্য্য করিতে হয় ত দাসদাসী করুক, তাঁহাদের স্বামীর আত্মীয়স্বজন করুক। তাঁহারা কিসের জন্য? নিশ্চয়ই গৃহ শোভনার্থ নন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র "কর্ম্মে ক্ষয় আরামে জয়।" তাঁহারা এই মূল মন্ত্রের উপাসক। উমা সে শ্রেণীর হিন্দু রমণী নন। তিনি নামে ও কার্য্যে যথার্থ হিন্দুললনা। তাই তিনি বিপুল উৎসাহে কন্যার বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্তা হইলেন। তিনি অপরা-পর আত্মীয় ও প্রতিবেশিনীগণে পরিবৃতা হইয়া মেনকা রাণীর বিবাহ-

কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি কর্ম্মিণী দলের প্রধানা নেত্রী ও কার্য্য ব্রতা। তিমি সকলকেই সমান আদর করিতেছেন—কাহাকেও মা, কাহাকেও বোন, কাহাকেও পিসী, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও খুড়ী, কাহাকেও জেঠাই ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া ও সেবায় আপ্যায়িত করিয়া, মেনকাদেবীর বিবাহে লোক জনের আহ্বান ও সেবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি মহাশয়ও বিবাহরূপ লড়াইয়ের রসদ যোগাড়ে বিশেষ ব্যস্ত। তবে এ ব্যস্ততায় সুখ আছে, আরাম আছে, স্ফূর্ত্তি আছে, ব্যাকুলতাও আছে সত্য—তাহা কিন্তু আনন্দদায়ক। আর যাহার বিবাহের জন্য এই উদ্যোগ, এই ব্যস্ততা, এই ব্যাকুলতা ও বিপুল আয়োজন, সেই মেনকারাণী,—কিসের জন্য এই ব্যগ্রতা, ব্যস্ততা ও বিপুল আয়োজন, তাহা বিশেষ কিছু বুঝিতেছে না। তবে হিন্দু বালিকার সরল বিশ্বাস, যখন তাহার পরমারাধ্য মাতা-পিতা এইরূপ আয়োজন করিতেছেন, এবং যখন সে নিজেই সমস্ত আয়োজনের কেন্দ্র, তখন নিশ্চয় সে-সমস্তই তাহার মঙ্গলের জন্য, আর সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সেও পরমানন্দিতা। তাহার মন সদাই প্রফুল্ল।

৩

ভক্তি, ভালবাসা ও সেবার সর্ব্বত্র জয়

আজ দুই বৎসর হইল, শিরোমণি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহনের সহিত মেনকারাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার শ্বশুর ও তাহাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করেন। মেনকা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা ও প্রথমা পুত্রবধূ, অতএব বিশেষ আদরের সামগ্রী; তাঁহারা মেনকারাণীকে বিশেষরূপে আদর যত্ন করিতেন। আর তাহার স্বামী?—এইখানেই সব গণ্ডগোল; তিনি নিজের কর্ম্ম ছাড়া পৃথিবীর আর সকলের কর্ম্ম করিতেন।

যদিও তাঁহার বিদ্বান্ পিতা, শত শত বালককে বিদ্যাদান করিয়াছেন, আর এখনও শত শত বালককে বিদ্যাদান করিতেছেন, কিন্তু তিনি নিজের ঔরসজাত পুত্রের বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে কিছুই সাহায্য করিতে পারেন নাই। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়! ইহা কি কম আক্ষেপের কথা! আমাদের দেশে প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। পিতা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত; আর পুত্র পিতার সঞ্চিত অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত প্রায়ই অন্য কোন সম্পত্তির, গুণের বা বিদ্যার উত্তরাধিকারী হন না। পিতা দেশের কাজে ও দশের কাজে ব্যস্ত, পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে নজর দিতে তিনি সময় পান না। তিনি দেশের লোককে বিদ্যাদান করিতেছেন বা বিদ্যাদানের সাহায্য করিতেছেন, কেবল নিজের পুত্রের বিদ্যা-

শিক্ষা, নীতি ও শাস্ত্র শিক্ষা দিবার সময় তাঁর নাই, বা সে সময় তিনি দেন না। ফলে পুত্র পিতার সকল সম্পত্তির অধিকারী, কেবল অধিকারী বা অংশীদার নন্ তাঁহার বিদ্যার বা শাস্ত্রশিক্ষার বা সদগুণের।

শিরোমণি মহাশয়ের কিছুরই অভাব নাই; নাম, যশঃ ধন ও খ্যাতি সকলেরই তিনি অধিকারী। পুত্র বুদ্ধিমান্ এবং তাঁহার মানসিক বৃত্তিচয় বিশেষভাবে প্রভাসিত, অন্তঃকরণও অতি কোমল। প্রাণে দয়া আছে, দাক্ষিণ্য আছে, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে,—নাই কেবল বিদ্যাশিক্ষা, নাই কেবল শাস্ত্র-জ্ঞান, নাই কেবল শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-শিক্ষা বিষয়ে একাগ্রতা —জমি খুব উর্ব্বর, চাষ ভাল হয় নাই।

ধর্ম্ম ও শাস্ত্র শিক্ষায় তাঁহার একাগ্রতা নাই, মনোযোগ নাই, অধ্যবসায় নাই। যে সব গুণ তিনি তাঁহার জন্মের সহিত উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন, সে সবই আছে, আর যে সব গুণগুলি অর্জ্জন করিবার জন্য নিজের চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায় ও মনঃসংযোগের প্রয়োজন, সেই সব শিক্ষাই,—ধর্ম্ম-শিক্ষা, শাস্ত্র-শিক্ষা, উপেক্ষিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার উৎকর্ষ একেবারেই হয় নাই। ফলে, সব থাকিতেও, হরিমোহনের নিজস্ব কিছুই নাই; অথবা সব গুণের আকর তাঁহার ভিতর নিহিত থাকিতেও, তিনি ধর্ম্মশিক্ষাহীন, শাস্ত্রশিক্ষাবিহীন। পরের দুঃখে তিনি দুঃখী, পরের অভাবে তিনি ক্লেশ বোধ করেন, দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার প্রাণ বিলোড়িত হয়। দুঃখীর দুঃখমোচন তাঁহার দৈনিক কার্য্য, দানে তিনি চির-অভ্যস্ত। কেবল নাই তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে একাগ্রচিত্ততা ও মনোনিবেশ।

মেনকা আসিয়া দেখিলেন, স্বামীর মন উচ্চ, প্রাণে দয়া আছে,

দাক্ষিণ্য আছে, পরের দুঃখে সহানুভূতি আছে; নাই কেবল নিজের উন্নতির চেষ্টা। তিনি এইরূপ দেখিয়া প্রাণপণে তাঁহার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কিরূপে তাঁহার স্বামী ধর্ম্ম ও শাস্ত্র শিক্ষালাভ করিবেন, তাহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইল এবং প্রাণপাত করিয়া তিনি সেই মন্ত্রের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি সে বিষয়ে উদ্যোগিনী হইলেন বটে, কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে তাঁহার সে সৎ-চেষ্টার প্রতিঘাত (response) পাইলেন না। তিনি যখন ভট্টপল্লীতে যান, তখন বিশেষ চেষ্টা করিয়া স্বামীর শিক্ষার উৎকর্ষের প্রথম সোপান প্রস্তুত করেন; আবার যখন তিনি পিতৃগৃহে আসেন, তখন সেই সোপান বিস্মৃতি-সলিলে নিমগ্ন হইয়া যায়।

ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, ধর্ম্মহীন শাস্ত্রজ্ঞানহীন জামাতার জন্য বাচস্পতি মহাশয়ের আত্মগ্লানি ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রমাগত ভাবিতে লাগিলেন—ভগবান্, এ কি করিলে? আমার অন্নের একমাত্র ব্যঞ্জন অধিক মাত্রায় লবণাক্ত করিলে। আমার একমাত্র কন্যা, আর সেই কন্যার স্বামী আমার জামাই বিদ্যাহীন্ হইল। আমার এত দিনের বিদ্যা-গরিমায় উন্নত মস্তক, বংশের একমাত্র কন্যা বিদ্যাহীন জামাতার হস্তে পড়ায়, হেঁট হইল; অথবা ভূমিতলে পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইল; আমার বংশগৌরব একেবারে ধূলিশায়ী হইল। ভগবান্ তোমার এ কি খেলা, তোমার এ কি লীলা!

জামাতা যখনই তাঁহার বাটীতে আসেন, তখনই তিনি তাঁহাকে বলেন —বাবা তুমি পণ্ডিতের পুত্র, আর পণ্ডিত বংশের জামাতা, তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না হইলে তোমার নিজের

বংশ-মর্য্যাদায় কালিমা পড়িবে, আমার বংশ-মর্য্যাদায়ও কালিমা পড়িবে। বাবা, চেষ্টা করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন কর, নিজের বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ, আমার বংশ-মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ রাখ। যখনই তিনি গোপালপুরে আসেন, তাহার শ্বশুর মহাশয় ও শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে এইরূপে বুঝান ও তাহার আত্মগ্লানির উদ্রেক করেন।

মেনকারাণী কিন্তু কেবল তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। তিনি সবই জানিতেছেন ও শুনিতেছেন ; তথাপি তাঁহার স্বামীকে একটিও রূঢ় কথা বলেন না, অথবা কথায় বা কার্য্যে এমন ভাব কিছুমাত্র দেখান না, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন না।

হরিমোহন পত্নীর এই নিরবচ্ছিন্ন সদ্ব্যবহারে ও সেবায় অধিক লজ্জিত হন, আর প্রত্যেক বারেই মনে করেন, এইবার ভট্টপল্লীতে গিয়া বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করিবেন,—এইবার যখন এখানে পুনরায় আসিবেন, তখন বিশেষ বিদ্যালাভ করিয়া আসিবেন। মনে মনে তিনি এইরূপ কল্পনা করেন সত্য, কিন্তু যখনই তিনি আবার ভট্টপল্লীতে ফিরিয়া যান, তখনই তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গীদের দলে পড়িয়া আবার তাঁহার পূর্ব্ব কল্পনা একেবারে তাঁহার মন হইতে মুছিয়া যায়, আবার তিনি ‘যে কে সেই’। সব ভুলিয়া সেই সঙ্গীদের সঙ্গে ভূত নাচাইয়া বেড়ান, লেখা পড়ার কথা একেবারেই ভুলিয়া যান। তাঁহার প্রেমময়ী সুহাসিনী ও সুভাষিণী পত্নী কাছে না থাকায়, বিদ্যার্জ্জনে তাঁহার যে সহানুভূতি তাহাও তাঁহার উপর কোন কার্য্যই করে না। ফলে তিনি “যে তিমিরে সেই তিমিরে”।

এইরূপে তিনি তিন চারি বার শ্বশুরালয়ে আসিলেন, শ্বশুর কর্ত্তৃক মিষ্টভাষে ভৎ‌র্সিতও হইলেন। শ্বাশুড়ীর নিরবচ্ছিন্ন যত্নে ও ভালবাসায়

এবং স্ত্রীর নিরবচ্ছিন্ন সেবায় ও পূজায় নিরতিশয় আত্মগ্লানি ভোগ করিলেন। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, তিনি যা ছিলেন তাহাই রহিলেন। তবে কেবল মধ্যে মধ্যে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিতেছিল, প্রাণে উদ্বেগের ঢেউ উঠিতেছিল, আবার জল বুদ্‌বুদের ন্যায় জলের সহিত মিলাইয়া যাইতেছিল; আবার সেই "যথাপূর্ব্বং তথাপরম্"।

একবার তিনি গোপালপুরে আসিতেছিলেন, নদী পার হইবার সময়ে মনে পড়িল, তাঁহার শ্বশুরের মিষ্ট ভৎর্সনা—আর মনে পড়িল তাঁহার স্ত্রীর হাসিমাখা মুখ ও তাঁহার নির্ব্বাক সাদর সম্ভাষণ। এই দুয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসে তিনি বড়ই জর্জ্জরিত হইলেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এরূপ গুণবতী স্ত্রীর স্বামী হইবার তিনি একেবারেই উপযুক্ত নন; তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বাক্ প্রেম, ভক্তি, সেবা ও পূজা তাঁহার প্রাণকে আরও অধিকতর আলোড়িত করিল। তিনি ভাবিলেন, কি করা যায়? এই ইচ্ছামতী নদী পার হইলেই ত তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের ও মেনকারাণীর সম্মুখীন হইবেন, তখন তাঁহাদিগকে কি বলিবেন, কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, কি বলিয়া বুঝাইবেন যে, তিনি তাঁহাদের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন? তাঁহার স্ত্রীর প্রেম, ভক্তি সেবায় বা পূজায় তাঁহার শুষ্ক প্রাণ মুঞ্জরিত হইতেছে।

এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হইল। মনে হইল, গুছাইয়া এই প্রশ্নটি করিতে পারিলে, তিনি তাঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতে পারিবেন যে, তিনি চেষ্টা করিতেছেন। যদিও তিনি বুঝিলেন যে, সে প্রয়াস মিথ্যায় স্থাপিত ও মরীচিকাময়, তাহার ভিত্তিতে কিছুমাত্র সত্য নাই, তথাপি বিপদে পড়িয়া তিনি সেই মিথ্যার আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। মনে করিলেন, এইবার যাহা হয় কোনরূপে উদ্ধার পাইলে বাড়ী গিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সব ত্যাগ করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় নিশ্চয়ই মন দিবেন;' ইহা স্থির নিশ্চয়। আর তিনি নিজের সহিত চাতুরী করিবেন না। মনকে চোক্ ঠারিবেন, না, নিজেকে নিজে আর ঠকাইবেন না। এবার কোনরূপে উদ্ধার পাইলে, আর তিনি নিজেকে প্রতারণা করিবেন না।

তিনি আবার ভাবিলেন—দূর হউক, এই নদী-বক্ষ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করি, আর এবার গোপালপুরে যাইব না। ভট্টপল্লীতে আবার ফিরিয়া যাই, নিজের প্রতি ঠিক ব্যবহার করিতে অভ্যাস করি, শাস্ত্রশিক্ষা অভ্যাস করি, নিজে সৎ হই, নিজে মেনকার উপযুক্ত হই, তবে গোপাল-পুরে যাইব, নতুবা নয়।

এমন সময় মেনকার আনন্দময় কমনীয় কোমল মুখ-জ্যোতিঃ তাঁহার মনে পড়িল, তখনই তাঁহার প্রাণ আকুলিত হইল, তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় মেনকার মুখশশী তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিল। মেনকার মুখচন্দ্রমা মধুর আকর্ষণে হারমোহনের গতিরোধ করিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নৌকা ফিরাইতে বলিবেন, কিন্তু কে যেন তাঁহার বাক্-শক্তি হরণ করিল। তাঁহার জিহ্বা শুকাইয়া গেল, তালুতে গিয়া ঠেকিল; তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

এদিকে ভাসিতে ভাসিতে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। হরিমোহন কলের পুত্তলিকার ন্যায় ডাঙ্গায় নামিলেন। নামিয়াই বাচস্পতি মহাশয়ের বাটীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আপন মনেই চলিতেছেন, কে যেন তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। বেকুব মাঝি পিছন হইতে

ডাকিল "ঠাকুর, পয়সা ?" হরিমোহনের চৈতন্য হইল। হরিমোহন পুঁটুলি হইতে পয়সা বাহির করিয়া মাঝিকে দিলেন। মাঝি হরিমোহনের উদ্দেশে মস্তক নোয়াইয়া বলিল, "ঠাকুর, প্রণাম হই" ; মাঝির "ঠাকুর, প্রণাম হই" এর ধাক্কা হরিমোহনের চৈতন্যকে ফিরাইয়া আনিল, হরিমোহনের সংজ্ঞা হইল।

এখন তাঁহার ভাবনা আসিল—তাই ত কি করা যায়! কিন্তু তিনি তখন গোপালপুরের পারে আসিয়াছেন। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বাচস্পতি মহাশয়ের একটি ছাত্র। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, আর মনে মনে ঠিক করিয়া লইলেন, যা থাকে কপালে ; নদীবক্ষে তিনি যে প্রশ্নের কথা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক করিলেন সেই প্রশ্নই যথাস্থানে ও যথাসময়ে উত্থাপন করিবেন। তিনি বলিলেন, "জন্মেজয়, আজ এক প্রশ্ন করিব। দেখি, তোমরা কি তার জবাব দাও, আজ তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির বহর বোঝা যাইবে।"

জন্মেজয় এই কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। জন্মেজয় ও অন্যান্য ছাত্রেরা বাচস্পতি মহাশয়কে পিতার ন্যায় ভক্তি ও মান্য করিতেন, তাঁহার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে তাঁহারা দুঃখী। কাজেই বিদ্যাহীন বাচস্পতি-জামাতার এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, "ভগবান্ এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, হরিমোহন শাস্ত্রশিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া তিনি দৌড়িয়া গিয়া বাচস্পতি মহাশয়কে খবর দিলেন ও প্রশ্নের কথা বলিলেন। শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি টোলে গিয়া ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন

"দেখ হে বাপু, আম গাছে আমই হয়, তেঁতুল হয় না। যেমন গাছ তাহার তেমনি ফল। ভট্টপল্লীর শিরোমণি মহাশয়ের পুত্রকে শাস্ত্রজ্ঞ হইতেই হইবে। দেখ, আমার জামাতা শাস্ত্রে অজ্ঞ হইতে পারে না। জল সকল সময়েই নিজস্তর অন্বেষণ করে, সূর্য্যদেব কখনও কিরণ বিতরণে পশ্চাৎপদ নহেন, একদিন মেঘাছন্ন থাকিতে পারেন, পরদিন মেঘমুক্ত হইবেনই হইবেন।"

বাচস্পতি মহাশয় টোল হইতে বাটীর মধ্যে গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন। গৃহিণীর পার্শ্বেই মেনকারাণী বসিয়াছিলেন; তিনি এই খবর শুনিলেন; শুনিয়া তিনি মা সরস্বতীকে মনে মনে বন্দনা করিতে লাগিলেন। আনন্দে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মা আনন্দময়ি, তুমিই ধন্যা, আর ধন্য তোমার সেবক-সেবিকা-মণ্ডলী।"

ক্রমে গোপালপুরে সোরগোল পড়িয়া গেল। বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে তৎপর দিবস শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র, রামচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের জামাতা, হরিমোহন এক প্রশ্ন করিবেন। পর দিবস নিকটস্থ পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে টোলে আসিয়া জুটিলেন। বাচস্পতি মহাশয়ের বক্ষ আজ আনন্দে আধ ইঞ্চি অধিক স্ফীত হইয়াছে। তিনি নিজে অপরাপর পণ্ডিত-মণ্ডলী ও ছাত্রমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া টোলে আসীন। হরিমোহন তথায় উপস্থিত।

হরিমোহন প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন, আপনারা সকলেই পুষ্করিণী দেখিয়াছেন?"

সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

হরিমোহন। যেখানে নূতন পুষ্করিণী খনন হয়, তাহার পাড়ে রাশিকৃত মাটি দেখিয়াছেন?

সকলেই বলিয়া উঠিল "হাঁ দেখিয়াছি, হাঁ দেখিয়াছি।"

বাচস্পতি মহাশয়ের বুক কিন্তু তখন দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

তিনি ভাবিলেন, ভগবান্ এ কি প্রশ্ন!

হরিমোহন। আপনাদের ইচ্ছামতী নদী দেখিয়াছেন?

সকলেই বলিল, "হাঁ দেখিয়াছি, হাঁ দেখিয়াছি।"

হরিমোহন। আচ্ছা, তবে বলুন দেখি, ইহার মধ্যস্থিত মাটি, যাহা খুঁড়িয়া দুপাড়ে স্তূপাকারে রাখা হইয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? সকলেই এই প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্। সকলেই ভাবিতে লাগিল, এ আবার কি প্রশ্ন?

বাচস্পতি মহাশয় প্রশ্ন শুনিয়া একেবারে অবাক্। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ বর্ব্বর অর্ব্বাচীন বলে কি? তিনি ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায় আর আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জান না বাপু, দুপারের মাটি কি হইল? এক পারের মাটি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন তোমার পিতা, কেন না তিনি তোমার মত পুত্রের জন্মদাতা; আর অপর পারের মাটি খাইয়া শেষ করিয়াছি আমি, কেন না আমি তোমার মতন বর্ব্বরের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি।"

প্রশ্ন শুনিয়া ও বাচস্পতি মহাশয়কে ক্রোধান্ধ দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই অবস্থায় যতদূর সম্ভব পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বাচস্পতি মহাশয় সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। হরিমোহন প্রস্তরময় মূর্ত্তিবৎ সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন; আর ভাবিতে লাগিলেন, করিলাম কি, এ' হল কি?

ক্রমে এই বার্ত্তা বাচস্পতি মহাশয়ের অন্দরে আসিয়া পৌঁছিল। মেনকরাণী এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলেন। ভাবিতে

লাগিলেন "ভগবান্, এ কি করিলে ; প্রভু তুমি যে দয়াল হরি, তুমি কি আমায় দয়া করিবে না ? প্রভু, আমি কি দোষ করিয়াছি যে, আমার এই শাস্তি ! ভগবান্, আমায় কূল দিন। আমায় রক্ষা করুন।"

সকলেই বিশেষ মর্ম্মাহত। কেবল উমাদেবী ভাবিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "তা হইয়াছে কি ? জামাতা ছেলে মানুষ, দুধের ছেলে, ক্রমে শিখিবে, ক্রমে মানুষ হইবে। ছেলেবেলা সকলেই আলবড়ে থাকে বয়স হইলেই শুধরাইয়া যায়।"

মেনকারাণী কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তিনি স্থির করিলেন, এ শোক-দুঃখের বা ক্রোধের সময় নয়। হরিমোহন যাহাই হউন না কেন, তিনি ত তাঁহার স্বামী, তাঁহার চিরজীবনের সঙ্গী। তিনি হিন্দুরমণী, স্বামীই তাঁহার উপাস্য দেবতা, তাঁহার জীবনসঙ্গী। তাঁহার চিরজীবনের সুখ দুঃখ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। সকলেই নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তিনি তাহা ত পারিবেন না। তাঁহার স্বামীকে ত্যাগ করিলে তাঁহার আর জীবনে কি রহিল ! তবে যেমন করিয়া পারেন, তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত করিয়া লইবেন।

তখন মেনকারাণীর মনে পড়িল, হিন্দুর উপাস্য রমণী সীতা দেবীর কথা, হিন্দুর উপাস্য সাধ্বী বেহুলার কথা, সাবিত্রী-দেবীর কথা, দময়ন্তীর কথা। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, বেহুলা সাধ্বী মনের বলে, অমানুষিক চেষ্টায় ও প্রগাঢ় ভালবাসার বলে মৃত পতিকে বাঁচাইয়াছিলেন, আর আমি মনোযোগ, চেষ্টা ও ভালবাসায় আমার অল্পবুদ্ধি স্বামীকে শাস্ত্রজ্ঞ করিতে পারিব না ? নিশ্চয়ই পারিব। যদি না পারি ত তাহা আমার নিজের দোষ ; আমার চেষ্টা ঐকান্তিক নয়, আমার যত্ন ঐকান্তিক নয়, আমার অধ্যবসায় অধ্যবসায়-

বাচ্য নহে। ঐকান্তিক চেষ্টায় নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে, আমার স্বামীকে আমি নিশ্চয় উদ্ধার করিব। আমি যদি যথার্থ সতী সাধ্বী পতিব্রতা হিন্দু-রমণী হই, তবে আমি আমার স্বামীকে উদ্ধার করিব, আমার স্বামীকে মনের মত করিব। না পারি, আত্মবিসর্জ্জন করিব।

হিন্দুরমণী যখন একাগ্রমনা হইয়া কোন কার্য্য করিবেন বলিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কি ক্ষমতা আছে যে তাঁহার মনের গতিরোধ করিতে পারে? সচরাচর লোকে বলে, রমণী—বিশেষতঃ হিন্দু-রমণী—অবলা; কার্য্য ক্ষেত্রে দুর্ব্বলা। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, ইহা সম্পূর্ণ প্রলাপবাক্য। তুমি চেষ্টা করিলে গঙ্গার সাঁড়াসাঁড়ি বান রোধ করিতে পার, কিন্তু হিন্দুরমণীর স্থির প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পার না। তিনি সকল বাধা, সকল রোধ উপেক্ষা করিবেন, কেহই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হইতে পারিবে না। সকল বাধা সকল বিপত্তি তাঁহার প্রতিজ্ঞার সম্মুখে, স্রোতস্বতী নদীর জোয়ারের সম্মুখে, এক খণ্ড তৃণের ন্যায়, ভাসিয়া যাইবে। তিনি তাহার ইচ্ছাকে ফলবতী করিবেনই করিবেন।

সহস্র সহস্র হিন্দু-রমণী তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা-পালন ও কর্ত্তব্য-পালনের জন্য নবীন জীবন উৎসর্গ করিয়া নামে ও যশে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। হিন্দু রাজপুতরমণীরা বংশমর্য্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অবাধে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। হিন্দুরমণীরা স্বামীর উদ্দেশে অবাধে সহমরণে গমন করিয়াছেন। হিন্দু আদর্শ-রমণী সাধ্বী বেহুলা বিবাহরাত্রে স্বামীহারা হইয়া স্বামীর মৃতদেহ লইয়া কলার মান্দাসে ভাসিয়াছিলেন, এবং একাগ্রতার বলে ও ঐকান্তিকতায় পতির উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়া মৃত পতিকে বাঁচাইয়াছিলেন।

এই সব আদর্শ যাঁহার সম্মুখে, এই সব আদর্শ যে হিন্দু রমণীর পৈতৃক সম্পত্তি, সেই হিন্দু-রমণী মেনকা মনে মনে স্থির করিলেন, হয় তাঁহার স্বামীকে তিনি উদ্ধার করিবেন, না হয় তিনি স্বামীর উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিবেন। এই স্থির করিয়া তিনি সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

মেনকারাণী মনে মনে স্থির করিলেন, আর স্বামীকে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গের হাতে ছাড়িয়া দিবেন না, তিনি শ্বশুরালয়ে স্বামীর কাছে কাছেই থাকিবেন। এই স্থির করিয়া তিনি শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, আর কখনও তিনি তাঁহার স্বামীর সঙ্গ ছাড়িবেন না।

সেই দিন রাত্রে তাঁহার স্বামী যখন তাঁহার কাছে আসিলেন, তখন মেনকা, দিনের বেলায় যেন কিছুই হয় নাই, এইরূপ ভাবে ব্যবহার করিলেন, দিনের কথা একেবারেই তুলিলেন না। বরং স্বামীর প্রতি অধিক যত্ন, অধিক সেবা শুশ্রূষা- রত। হইলেন।

হরিমোহন দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। তিনি ভাবিতেছিলেন, দিনের বেলায় শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কৃত হইয়াছেন, অপরাপর লোক সকল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কতই না অপমানিত করিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিশেষভাবে তিরস্কার করিবেন; কারণ, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার জন্য নিশ্চয়ই দিবাভাগে অনেকেরই নিকট হইতে নিন্দাবাদ সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে আশার বিপরীত ব্যবহার পাইয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত, একেবারে স্তম্ভিত! স্ত্রী যদি তাঁহাকে বিশেষভাবে ভৎর্সনা করিতেন, তাহা হইলে হরিমোহনের মনে অত কষ্ট হইত না, মন অত ব্যাকুল হইত না, প্রাণ অত ব্যগ্র হইত না; তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে রোক্‌শোধ হইয়া যাইত, দেনা পাওনা

মিটিয়া যাইত, বকেয়া বাকি কিছুই থাকিত না। যাহা সকলের হয়, তাঁহাদের মধ্যে তাহাই হইত, অতএব সেই ব্যবহারে কিছু নূতনত্ব থাকিত না। কিন্তু স্ত্রীর নিকট হইতে আশার অনুরূপ ব্যবহার পাইয়া তিনি একেবারে স্তব্ধ, একেবারে বাক্‌শূন্য। একেবারে সুখে অভিভূত হইলেন।

হরিমোহন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, মেনকা দেবী না মানবী? ভগবান তাঁহাকে যে উপাদানে গঠিত করিয়াছেন, তিনি কি মেনকাকেও সেই উপাদানে গঠিত করিয়াছেন? না তাঁহার উপাদান স্বতন্ত্র? অন্য স্ত্রীলোক হইলে ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর ধরিয়া তাঁহার জন্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া, বিশেষ সেই দিনের গঞ্জনার আতিশয্যে, সুদে আসলে তাহার ঋণ পরিশোধ করিত; কিন্তু মেনকা সেরূপ কিছুই না করিয়া বরং তাঁহাকে অধিক যত্ন, অধিক সেবা, অধিক পরিচর্য্যা করিতেছেন। হরিমোহন একেবারে অবাক্‌, একেবারে হতভম্ব হইলেন। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে প্রবল বেগে ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় ও আত্ম-গ্লানিতে তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন; দরদর বেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বাহিয়া দুঃখ, ক্ষোভ ও আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। দুঃখ ও ক্ষোভ,—কেন না তিনি এমন স্ত্রীরত্নের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; আর আনন্দ,—কেন না তিনি অনুপযুক্ত হইলেও এমন সদ্‌গুণ-সম্পন্না, সুরূপা, অন্তরে ও বাহিরে শ্রীযুক্তা স্ত্রীর স্বামী। ইহা কি কম ভাগ্যের কথা।

হরিমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে মেনকার হাত ধরিলেন। দুই হাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "মেনকা, তুমি কি আর একটিবার আমায় ক্ষমা করিবে? আর একটিবার আমায় সময় দিয়া দেখিবে, আমি তোমার উপযুক্ত হইতে পারি কি না? তুমি কাছে

থাকিলে আমার মানসিক প্রবৃত্তিগুলি এক পথে যায়, আর তোমা হইতে তফাৎ হইলে সেগুলি বিভিন্ন দিকে যায়। তুমি আমার কাছে থেকো,—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কাছে থাকিলে আমি নিজেকে ফিরাইতে পারিব। আমি তোমাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব, তোমার উপযুক্ত হইবার জন্য যত্ন করিব, আর ভগবানের ইচ্ছায় হয় ত একদিন কৃতকার্য্যও হইব। মেনকা, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না। সকলেই আমায় ত্যাগ করিতেছে, তুমি আমায় ছাড়িও না; সকলেই আমায় ঘৃণা করে, তুমি আমায় ঘৃণা করিও না। তুমি আমায় সাহায্য কর, আর আমিও নিজেকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব এবং হয় ত কৃতকার্য্যও হইতে পারিব।"

মেনকা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "স্বামিন্, আমি তোমার দাসী, তোমার ছায়া। আমার বাপ্ মা তোমার হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছেন। এ জীবনে তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমাদের হিন্দুর বিবাহ ভগবানের ইচ্ছাধীন; স্বয়ং ভগবানই তোমায় আমায় একত্র করিয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে তুমি আমি স্ত্রীপুরুষ রূপে এই জগতে আসিতেছি, এবং আবার আসিব। ভগবান্ তোমার মনে বল দিন, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিবে, আর এ দাসী চিরকালই তোমার সেবা করিবে, তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

মেনকা মাতাকে সকল কথা আভাষে বলিলেন। তবে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্বামীগৃহে যাওয়াই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলময়।

যাহা হউক, দুইদিন পরে হরিমোহন ও মেনকা ভট্টপল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্বশুর-গৃহে আসিয়া অবধি মেনকা তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী ও ছোট দেবর-

দের পরিচর্য্যায় রত হইলেন; তাঁহাদের সামান্য অভাবও মনে মনে বুঝিয়া তাহা পূরণ করিতেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় ব্যস্ত। আত্মীয় পরিজনের প্রতি এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, সকলেই তাঁহার গুণে ও পরিচর্য্যায় মুগ্ধ। সকলেরই মুখে তাঁহার সুখ্যাতি ধরে না। একবাক্যে সকলেই তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন।

স্বামীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতুলনীয়। যাহাতে স্বামীর কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। স্বামী কখন কি চান, কখন কি খান্, তাহার যোগাড়ে সর্ব্বদাই নিয়োজিত। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ও অপরাপর আত্মীয়দের মনের ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া লইয়া তাহা পূরণের জন্য ব্যগ্র। রাত্রে স্বামী কক্ষে আসিলে, সারাদিন তিনি কি কি কাজ করিয়াছেন, কৌশলে তাহার হিসাব লইতেন এবং পরদিন কি কাজ করা উচিত, তাহাও কৌশলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন। শাশুড়ীকে বলিয়া শ্বশুর মহাশয় যাহাতে আর একবার স্বামীর ধর্ম্মশিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখেন ও সুবন্দোবস্ত করেন, তাহারও আয়োজন করিলেন।

শিরোমণি মহাশয় দেখিলেন, এইবারের চেষ্টাতে তাঁহার আশার অধিক ফল হইতেছে। প্রতি দিন তিনি ও তাঁহার পুত্র উভয়েই আশার অধিক ফল পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইতেছেন; এবং নূতন নূতন উৎসাহে কার্য্য করিয়া উত্তরোত্তর আরও অধিক ফল পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে তিন বৎসর গত হইল। হরিমোহন একজন বিশেষ সুধীর সুবোধ শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা উন্নতির দিকে যাইতে লাগিল। তিনি অধিক উৎসাহের সহিত আরও

অধিক ধর্ম্মজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয়ও নব নব উৎসাহে সন্তানকে উত্তরোত্তর আরও শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ভট্টপল্লীর সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ! এ কি, হরিমোহন ছিল কি, আর হ'ল কি ? ক্রমে পূর্ব্ব সঙ্গিগণ হরিমোহনের অমনোযোগ হেতু তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। জমি উচ্চ হইলে পূতিগন্ধময় জল যেমন সেই উচ্চস্থান ত্যাগ করিয়া নিম্নস্থান অধিকার করে, সেইরূপ হরিমোহন যতই উচ্চ হইতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গিগণও ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে অপসারিত হইয়া নিম্নস্তরস্থিত লোকের সহিত মিলিত হইতে লাগিল।

মেনকা কথাপ্রসঙ্গে স্বামীর দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ বুঝিয়া পড়িয়া প্রত্যহই হিসাব লইতে লাগিলেন এবং নিজ সদ্ব্যবহারে তাঁহাকে আরও উচ্চে লইয়া যাইতে লাগিলেন। ভগবানের দয়ায় ও মেনকার চেষ্টায় হরিমোহনের জীবনস্রোত কর্ত্তব্যের পথে ও ধর্ম্মের পথে বহিতে লাগিল।

৪

রাধানাথ-বাটী

রাধানাথ-বাটী ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এই গ্রামটি বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু। ইহাতে অনেক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সঙ্গতিপন্ন লোকের বাস। অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা লক্ষ্মী-শ্রীযুক্তা।

মুক্তেশপ্রকাশ রায় এই গ্রামের এক সমৃদ্ধিশালী যুবক। মুক্তেশ বাবুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, ধন আছে, জন আছে, সুনাম আছে, অধিকন্তু দুর্নামও আছে, অহমিকা আছে, কাজে কাজেই শত্রুও আছে। শত্রু যখন তাঁহার নিজের মধ্যেই আছে, তখন বহিঃশত্রুও অবশ্যম্ভাবী।

তাঁহার পিতা পাঁচকড়ি সরকার হকনাহকপুরের বসু মহাশয়দের কেবল-চুরি পরগণার সদর নায়েব ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, তিনি প্রথমে পাঁচটাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করেন। পরের নিজের মেধা ও কার্য্য-নৈপুণ্যে সদর নায়েব পর্য্যন্ত হয়েন। তিনি বহুবৎসর ধরিয়া বসুজা মহাশয়দের জমিদারী চালাইলেন; তাহার ফলে একদিকে যেমন ভাঙ্গন ধরিল, অপর দিকে তেমনি চড়া পড়িতে লাগিল। বসুজা মহাশয়েরা ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, আর পাঁচকড়ি সরকার ক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি রায় জমিদার মহাশয় হইলেন।

রায় পাঁচকড়ি মহাশয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা দেশের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। জমিদার পাঁচকড়ি মহাশয়ের প্রতাপে বাঘে গরুতে এক

ঘাটে জল পান করিতে লাগিল ; অর্থাৎ যাহা কিছু জল সমস্তই জমিদার পাঁচকড়ি রায় মহাশয় পান করেন ; বাঘও কিছু পায় না, আর গরু ত পায়ই না। বাঘ গরু উভয়ে একই বিপদে পড়িয়া জমিদার রায় মহাশয়ের দাপটে বিশেষ শান্ত শিষ্ট ভাব ধরিয়া এক ডোরে বাঁধা দুটি উৎসর্গের পাঁঠার মতন সর্ব্ব সময়ে সমূহ বিপদ গণিয়া সন্তর্পণে বাস করিতে লাগিল। জমিদার পাঁচকড়ি রায়ের অক্ষুণ্ণ প্রতাপে সকলেই ভীত, ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ ; তিনি সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। তবে ভগবানের প্রতিফল-প্রদ পাল্‌টা নিয়মের ফলে (laws of retribution) তিনি নিজেও রায়-গৃহিণীর কাছে ব্যতিব্যস্ত ও ত্রস্ত, সেখানে রায়মহাশয়ের জারিজুরি একেবারেই খাটিত না। রায়-গৃহিণী রাগিলে প্রায়ই বলিতেন, ওঁর (পাঁচকড়ির) ক্ষমতা ত পাঁচকড়া, মাসে পাঁচ টাকা মাত্র। তবে তাঁহাকে গৃহে আনিয়াই তিনি এখন (পাঁচকড়ি) রায় জমিদার মহাশয় হইয়াছেন। তা তিনি যে হইয়াছেন, তাহা ত তাঁহারই বুদ্ধিবলে, নতুবা এতদিন রায়-মহাশয় সংসাররূপ মহাসমুদ্রে পড়িয়া কোথায় তলাইয়া যাইতেন ? কেবল রায়গৃহিণীর ন্যায় ভেলা পাইয়া এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। কথাটা কতকটা সত্যও বটে। রায়-ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয় শুকাইয়া কাষ্ঠবৎ হইতে লাগিলেন, আর রায়গৃহিণী ক্রমে আয়তনে বেশ বাড়িতে লাগিলেন। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াইলে, একটিকে হস্তিনী ও অপরটিকে মেষশাবক বলিয়া বোধ হইত।

তাহাদের একমাত্র পুত্র-সন্তান মুক্তেশপ্রকাশ ও দুই কন্যা—হেমপ্রভা ও মনোলোভা। পাঁচকড়ি রায় মহাশয়ের নিজের সরস্বতীর সহিত বিশেষ নিকট সম্পর্ক না থাকিলেও রায়গৃহিণী হৈমবতীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে

মুক্তেশপ্রকাশ সরস্বতীর একজন বিশেষ অনুগৃহীত পুত্র হইয়াছিলেন। তিনি একজন কৃতবিদ্য যুবক। রায়গৃহিণী হৈমবতীর চেষ্টায় ও যত্নে হেমপ্রভা ও মনোলোভা দুইজনেই গৃহকর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন এবং মুক্তেশপ্রকাশের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে সরস্বতীদেবীরও কিয়ৎপরিমাণে অনু-গৃহীতা হইয়াছিলেন। ফলে হেমপ্রভা ও মনোলোভা দুজনেই লেখাপড়া জানা, ও গৃহকার্য্যে বিশেষ নিপুণা। সাংসারিক কার্য্যে, কলাবিদ্যায়, ভাষাবিদ্যায় ও শাস্ত্রচর্চ্চার তাহাদের বিশেষ গুণপনা লক্ষিত হইত।

হৈমবতী দেখিয়া শুনিয়া গৃহস্থ ঘরের দুইটি কৃতবিদ্য যুবকের সহিত কন্যা দুইটির শুভপরিণয় সম্পন্ন করিয়া দেন। হেমপ্রভার বিবাহ হয়, রাঘবপুরের মহেশচন্দ্রের সহিত ; আর মনোলোভার বিবাহ হয়, বলরামপুরের ক্ষণেশ-কুমারের সহিত।

৫

"উনিশ বিশের" কি বিষ

রাঘববলপুরে জমিদার রামহরি ঘোষ ওরফে জবরদস্ত ঘোষ প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার। রাঘববলপুরের প্রাচীন ইতিবৃত্তে জানা যায়, রামহরি ঘোষের পূর্ব্বতন দুই পুরুষও জমিদার ছিলেন, আর রাঘববলপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাদের প্রভূত পরাক্রমের ইতিহাস ওয়াকিব হাল ছিলেন।

রামহরি ঘোষের হুকুমই—এই অদেশের আইন। এমন কোন লোক এই প্রদেশে বাস করেন নাই, যিনি রামহরি ঘোষের হুকুম অমান্য করিতে সাহস করিতেন। তাঁহার হুকুম অমান্য করা ও নিজের উপর বিপদ ডাকিয়া আনা—এই দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান ছিল না। যে তাঁহার হুকুম অমান্য করিবে, তাহারই বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই ধ্রুব সত্যটুকু সকলেই জানিত বলিয়া কেহই তাঁহার হুকুম অমান্য করিত না, কেহই তাঁহার কথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইত না।

রামহরি ঘোষের একমাত্র পুত্র সুপ্রকাশ ঘোষ, ও একমাত্র কন্যা রাজকুমারী। রাজকুমারী জীবনের প্রারম্ভ হইতেই রাজকুমারীর ন্যায় লালিতা পালিতা হইয়াছিল। রামহরি ঘোষের গৃহিণী জগদম্বা কন্যার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠা হইয়া অবধি পনর বৎসর ধরিয়া রাজকুমারী এমন কিছুই মনে করে নাই, যাহা সে পায় নাই; যখন যাহা চাহিয়াছে

সে তাহাই পাইয়াছে। সে পনর বৎসর ধরিয়া ইচ্ছার কিছুমাত্র রোধ পায় নাই। অবস্থাপন্ন মাতাপিতা মনে করিতেন, আমাদের সবে ধন নীলমণি—কেবলমাত্র একটি কন্যা, তাহার কোন সাধে বাদ সাধিব না, তাহার কোন কামনার গতিরোধ করিব না। আমাদের অভাব কিসের? অতএব আমাদের একমাত্র কন্যার অভীষ্টের প্রতিরোধ আমরা প্রাণ থাকিতে করিব না, সে যাহা চায় তাহাই তাহাকে দিব। ফলে রাজকুমারীর ইচ্ছা হইলেই তখনই তাহার পূরণ হইত। কখনও তাহার মনস্কামের বিরুদ্ধে কার্য্য হয় নাই, সে যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। ফলে সে আকাঙ্ক্ষার বেগধারণ করিতে কখনও শিক্ষা করে নাই এবং তাহার ধনশালী মাতা-পিতাও সে বিষয়ের প্রয়োজন কখনও হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। গরীবের ইচ্ছার পূরণ হয় না, ধনকুবেরের কেন সেরূপ হইবে? ইচ্ছার পূরণ হয় না, অর্থের অভাবে; যখন তাঁহাদের অর্থ আছে, তখন তাঁহাদের এক-মাত্র কন্যার ইচ্ছা-পূরণ হইবে না কেন? পূজা, ব্রত; অভ্যাস, যোগ, গরিবের জন্য, বিত্তশালীর জন্য নয়।

তাঁহাদের অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠতর থাকিতে পারে, তাহা রামহরি ও জগদম্বা জানিতেন না বা বিশ্বাস করিতেন না। সকলেই তাঁহাদের মান্য করে ও বাহ্যিকপূজা করে, কাজেই তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ-জীব। তাঁহারা কন্যাকে কখনও পূজা-ব্রত করেন নাই, আর কন্যাও তাহা কখনও করে নাই। পূজা বা ব্রত উপলক্ষে কখনও কোন কামনার দমন করে নাই, কোন শিক্ষার জন্য কখনও কোন শ্রম স্বীকার করে নাই, ব্রত উপলক্ষে ক্ষুধা দমন করিয়া কখনও কোন মনোরথের বেগধারণ করিতে শিখে নাই। পূজা উপলক্ষে সে নিজেকে ছাড়া

অপরকে উচ্চ আসন দিয়া পূজা করিতে শিক্ষা করে নাই, শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কখনও গুরুর গুরুত্ব ও আধিপত্য স্বীকার করিতে শিখে নাই, কখনও নিজের চেয়ে অপরকে বড় বলিয়া স্বীকার করিতে ও কার্য্য করিতে শিখে নাই, কখনও হৃদয়ের বেগধারণ করিতে শিখে নাই। ফলে জীবনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বুঝিয়াছে, আর অপর সকলকেই নিজের চেয়ে ছোট ভাবিতে শিখিয়াছে। এইরূপ ছাঁচে-ঢালা মানসিক বৃত্তিগুলি লইয়া পনর বৎসর ধরিয়া মাতাপিতাকে নিরবচ্ছিন্ন আমোদ দিয়া রাজকুমারী শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল।

এতদিন ধরিয়া রামহরি জগদম্বা কাহারও কাছে মাথা নোয়ান নাই। এ জগতে তাঁহাদের যে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের ধন আছে, মান আছে, লোকজন আছে, নাম ডাক আছে। যাহা লোকে চায়, তাহা সবই আছে, তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষী নন। সাংসারিক সুখের জন্য তাঁহাদের অপর কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে না, তাঁহাদের নিজের যাহা কিছু আছে, তাহা লইয়াই বিশেষ সুখী। রাঘববল্লপুরের বাহিরে যে আর কোন ঈপ্সিত জিনিস থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদের কখনও বিশ্বাস ছিল না। কাজেই তাঁহাদের চেয়ে বড় আর কোন পরাক্রমশালী জীব থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা কখনও মনে করেন নাই।

জীবন্ত দেবতা তাঁহারা কখনও দেখেন নাই, সেই জন্য দেবতারা তাঁহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী, তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। ভগবান্ সম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পান নাই। তবে মোটামুটি ভগবান্ একজন আছেন, এইরূপ একটা ধারণা তাঁহাদের ছিল। কিন্তু

থাকিলেও তিনি দেবতা, সাংসারিক কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করেন না; সুবিধা হয় তাঁহাকে মানিও, তাহা না হয়, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দেখুন না কেন, জমিদার জবরদস্ত ঘোষ তাঁহার প্রজাদের উপর হুকুমজারি করিলে যে সব প্রজা তাঁহার হুকুম তামিল না করে, জবরদস্ত ঘোষ তাহাদের চাল কাটিয়া উঠাইয়া দেন বা ভিটা মাটি ভূমিসাৎ করিয়া দেন, আর তাঁহার লোকজন সব সেই প্রজাদের উপর কি অত্যাচারই না করে। কিন্তু কই ভগবান্ ত তাঁহার জ্ঞানতঃ কখন কোন হুকুম জারি করেন নাই, আর হুকুম তামিল না করিলে কাহারও চাল কাটিয়া উঠাইয়া দেন নাই বা বাটী ভূমিসাৎ করিয়া দেন নাই? ভগবান্ থাকেন ত থাকুন, তবে তিনি কাহারও উপর হুকুম জারি করেন না বা কাহারও উপর জোর জুলুম করেন না। ভগবান্, থাকিলেও তিনি অতিশয় নিরীহ-প্রকৃতি, তাঁহার থাকা না থাকায় কিছু আসিয়া যায় না।

এইরূপ ভাবিয়া রামহরি ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন না বটে, তবে বিশেষরূপে স্বীকারও করিতেন না। তাই রামহরি ও জগদম্বা অন্য কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন না, নিজেদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

যাহা ধ্রুব সত্য, তাহা সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই সত্য ও গ্রহণীয়; যাহা মিথ্যা, তাহা সময় বিশেষ ও অবস্থা বিশেষে সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেও সময়ে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ভুল ধরা পড়েই, তবে আশু বা অনেক দিন পরে। আর ভুল ধরা পড়িলে মানুষের কম বেশী চৈতন্য হয়; আর চৈতন্য হইলে তখন বুঝিতে পারে, কি ভুল সে করিয়াছে, আর ভুলের জন্য কতদূর ভুল পথে আসিয়া পড়িয়াছে।

রাজকুমারীর বয়স পনের বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তখন জগদম্বার চৈতন্য হইল, যে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তখন তাঁহার মনে পড়িল যে, কন্যার বিবাহ হইলে সে তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর গৃহে যাইবে। তখন তাঁহার কষ্টের সহিত মনে পড়িল, কন্যার সুখ দুঃখ কতক পরিমাণে ভাবী জামাতার উপর নির্ভর করিতেছে। কেমন করিয়া তিনি মনের মত ভাবী জামাতা পাইবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে হঠাৎ বিচলিত করিল। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রামহরি বাবু ও জগদম্বা পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা জোর ধাক্কা খাইয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য তাঁহাদিগকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কি করেন উপায়ান্তর নাই। তবে তখনও তাঁহাদের এই বিশ্বাস, যখন ধন আছে, জন আছে, মান আছে, তখন উপযুক্ত পাত্র পাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। কারণ তাঁহারা যখন যাহাকে যে কথা বলিয়াছেন, সকল সময়েই প্রত্যেকই তাঁহাদের সেই কথা হুকুম বলিয়া পালন করিয়াছে। তবে এখনও সেইরূপ হইবে না কেন?

প্রবলবেগে পাত্র অন্বেষণ হইতে লাগিল। তাহার আবার ধূমই বা কি? তবে ভয়ে ও অর্থলোভে যে যাহা পারে করিতে লাগিল, ভক্তি, শ্রদ্ধা বা ভালবাসা প্রণোদিত হইয়া নয়।

দুইজনে শেষোক্ত মনোবৃত্তিগুলিকে মানসিক দৌর্ব্বল্যের, চিহ্নস্বরূপ বলিয়া জানিতেন, কাহাকেও কখন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন নাই, কাহাকেও কখন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন নাই। তাঁহাদের ভালবাসা-হেতু কেহ তাঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে নাই। অনেকে তাঁহাদিগকে ভয় করিত

বটে, তবে কেহই তাঁহাদিগকে ভক্তি করিত না। তাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভীতির সঞ্চার হইত—ভক্তির নয়।

প্রথমে সর্ব্বগুণসমন্বিত রূপবান্ উচ্চবংশোদ্ভব বিশেষ বিত্তশালী পাত্রের জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। গোড়ায় তাঁহার পারিষদবর্গ সকলেই বলিতে লাগিল, "মহাশয়, বহু ভাগ্যফলে তবে আপনার কন্যারত্নকে কেহ পুত্রবধূ করিয়া ধন্য হইবে, ইহা বহু তপস্যার ফল। ঝাঁকে ঝাঁকে বরের বাপের দল সুগন্ধি পুষ্পের মধু-লোভে অলিকুলের ন্যায় আপনার বাটীর চারি পাশে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। রামহরি ঘোষের কন্যাকে পুত্রবধূ করা কি কম ভাগ্যের কথা!" তোষামুদেরা তাঁহাকে অনেক ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও কার্য্যে কিন্তু অলিকুলের দল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার দ্বারে আসিয়া কন্যারত্নের জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল না। ক্রমে তিনি নিজে খোদ রামহরি ঘোষ জমিদার জামাতার অন্বেষণে বাহির হইলেন। তখনও কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, যেমন তিনি জামাতার অন্বেষণে বাহির হইবেন, অমনি জামাতা পাইবেন।

এতদিন ধরিয়া শ্রীযুক্ত বাবু রামহরি ঘোষ জমিদার এমন কি ইচ্ছা করিয়াছেন, যাহা ইচ্ছামাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয় নাই? হতাশ হওয়া কাহাকে বলে, তাহা ঘোষজা মহাশয় কখনও জানেন নাই, কিন্তু হায়, তিনি নিজে বাহির হইয়াও মনের মত পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

সময় কিন্তু নিজ মনে বহিয়া যাইতে লাগিল। কার্য্যসিদ্ধি তবুও হই-তেছে না। প্রথমে ষোল আনা মনের মতন পাত্রচয়ন আরম্ভ করিয়া যত সময় চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই এক আনা এক আনা করিয়া, কম নিখুঁত পাত্রতেই পুরুষানুক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার ঘোষজা মহাশয়

রাজী হইলেন। তাহাও ত মেলে না—কুলগৌরবে না, জনে না, অর্থে না, সামর্থ্যেও না।

রামহরি ঘোস জমিদার মহাশয় কখনও কাহারও সহিত সমানভাবে ব্যবহার করেন নাই, কখনও কোন ব্যক্তিকে প্রেমালিঙ্গন দেন নাই; তিনি চির জীবনটা প্রজা-উৎপীড়নে কাটাইয়াছেন, লোককে ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছেন। কাজেই যখন নিজের প্রয়োজন বশতঃ লোককে আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য আলিঙ্গন করিতে গেলেন, লোকেও তাঁহার ব্যবহারের পূর্ব্ব ইতিহাস জানিয়া পিছাইয়া তাঁহার সময়োপযোগী আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল।

রামহরি জীবনে এই প্রথম ধাক্কা পাইলেন; তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে বেসুর ঘা পড়িতে লাগিল। চেষ্টা যত বিফল হইতে লাগিল, তত তিনি নিজের সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষকে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার নিজের ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তখন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের ক্ষমতার বাহিরে যে আর কোন ক্ষমতা বা শক্তি আছে তাহা তাঁহার বিবেচনার অতীত। ক্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও রামহরি ঘোষ মহাশয় ষোল আনা নিখুঁত পাত্র ত পাইলেন না। তাহার পর আট আনা ঈপ্সিত পাত্র পাওয়াও বিশেষ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে দুই বৎসর ধরিয়া অশেষ চেষ্টার পর রামহরি রাধানাথ বাটীর জমিদার পাঁচকড়ি রায়ের পুত্র মুক্তেশপ্রকাশ রায়ের সন্ধান পাইলেন।

পাত্র সর্ব্ববিষয়েই উপযুক্ত, তবে বনিয়াদিবংশের নয়। মুক্তেশপ্রকাশ জমীদারের পুত্র বটে, তবে জমীদারের পৌত্র নহে, মুক্তেশের ঠাকুরদাদাকে কোন লোক ধনশালী বলিয়া জানিত না। সেই এক অসুবিধা, সেই এক

খুঁৎ। প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার রামহরি ঘোষের পিতাও জমিদার ছিলেন, পিতামহও জমিদার ছিলেন। এরূপ অবস্থায় যে জমিদারের পুত্র নয়, এমন লোককে বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ করিতে প্রবল-পরাক্রান্ত দুই-পুরুষ বনিয়াদি জমিদার রামহরি ঘোষের আপত্তি আছে। কিন্তু জগদম্বার তাহাতে কোন বিশেষ আপত্তি নাই। তিনি জমিদারের গৃহিণী বটে, জমিদারের কন্যা ত নন, তিনি এ পার্থক্যের মর্ম্ম কি করিয়া বুঝিবেন?

যখন পিতা, মাতা ও ভ্রাতা সকলে মিলিয়া এই প্রসঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতেন, রাজকুমারী সমস্তই শুনিতে পাইত; আর প্রথম হইতেই তাহার মনে বিশ্বাস হইল, তাহার স্বামী বংশ মর্য্যাদায় তাহার উপযুক্ত নন। কাজেই প্রথম হইতে সে যে তাহার ভাবী স্বামী অপেক্ষা বড়, এই বিশ্বাসই তাহার মনে বদ্ধমূল হইল।

মুক্তেশপ্রকাশ অপেক্ষা সৎপাত্র পাওয়া অসম্ভব দেখিয়া পুরুষানুক্রমে জমিদার রামহরি ঘোষ, নূতন জমিদার পাঁচকড়ি রায়ের পুত্র মুক্তেশপ্রকাশ রায়কে দুঃখিত মনে কন্যাসম্প্রদান করিতে রাজি হইলেন, এবং তাঁহাকে যে মাথা নীচু করিতে হইল, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। এইবার তিনি প্রথম বুঝিলেন, তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্ব সময়ে পূর্ণ হয় না এবং মনস্তুটির জন্য তাঁহাকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়।

উপায়ান্তর না দেখিয়া ২৫শে ফাল্গুন রাজকুমারীর বিবাহের দিন স্থির হইল। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—ধনীর জন্য নয়, গরীবের জন্য ত নয়ই। রামহরি ঘোষ ২৫শে ফাল্গুন দিন স্থির করিয়া দেখিতেছিলেন, সেই লগ্নের পূর্ব্বে অন্য কোন মনের মত পাত্র পাওয়া যায় কি না। সেইজন্য তিনি মনে করিতেছিলেন যে, ২৫শে ফাল্গুনটা যত দেরীতে আসে, ততই

ভাল। কিন্তু সময় তাঁহার ইচ্ছাকে মান্য করিল না, ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাত্র মনের মত হউক আর নাই হউক, রাজকুমারী ত তাঁহাদের কন্যা, অতএব মহা ধূমধামে বিবাহ হইয়া গেল।

রাজকুমারী বিবাহ-উপলক্ষে রাধানাথবাটীতে আগমন করিল। প্রথম হইতেই তাহার মনে রহিয়া গেল যে, মুক্তেশপ্রকাশ তাহার ঠিক উপযুক্ত নহে, তাহাতে গিনি অপেক্ষা চারি আনা খাদ আছে। রাজকুমারী নিজে খাঁটি গিনিসোনা, আর মুক্তেশ প্রকাশে চারি আনা খাদ আছে। ফলে নিক্তির ওজনে তাহারা তুল্যমূল্য নয়। রাজকুমারীর দিকে পাল্লা ভারী, কাজেই সে গোড়া হইতে রাশ টানিয়া রাখিতে লাগিল। মুক্তেশ-প্রকাশকে বিশেষ কোন পাত্তা দেয় না।

প্রথম প্রথম মুক্তেশপ্রকাশ মনে করিতে লাগিলেন, রাজকুমারী এই সবে তাঁহাদের বাটী আসিয়াছে, এ নূতন জায়গা, পূর্ব্বে সে কখনও আসে নাই। কাজেই এস্থলে তাহার মনোবৃত্তিগুলি বিশেষভাবে বিকাশ পায় নাই। সে অবস্থান্তরে তাঁহার নিকট যেরূপ সুন্দরভাবে আপনাকে দেখাইতে পারিত, এ অবস্থায় তাহা পারে নাই। মুক্তেশপ্রকাশ রাজ-কুমারীর ব্যবহারে কোন খুঁত দেখিতে পাইলেন না।

গোড়া হইতেই হেমপ্রভা একটু গোঁত্তা খাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা মনোলোভা ততটা কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

ফুল-শয্যার পরদিন প্রাতঃকালে রাজকুমারী ও হেমপ্রভার যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ ;—

হেমপ্রভা। বউদিদি, কালরাত্রে কেমন ছিলে? কোনরূপ ত কষ্ট হয় নাই।

রাজকুমারী। না, এমন কিছু বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

মনোলোভা। তবে অবিশেষ কষ্ট কিছু হ'য়েছিল না কি ?

রাজকুমারী। তা ত হবেই, বিশেষ চারিদিকে গোলমালে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল। তোমাদের এখানকার লোকগুলো বড় বেশী চেঁচায়। আমাদের সেখানে এরূপ হবার নয়।

হেমপ্রভা। কি জান, বৌদিদি, কাজের বাড়ী। বিশেষ এক মহা আমোদের দিন, দাদাবাবুর ফুলশয্যার দিন। এখানে সকলেরই জীবনের একটা প্রধান আমোদের দিন। এ রকম দিনে মনের ভিতরের উচ্ছ্বাস বাহিরে ফুটে উঠে, কাজেই সকলেই একটু বেশী চেঁচামেচি করে। কাজের বাড়ীতে এমন একটু হয়ই।

রাজকুমারী। লোকে চেঁচামেচি করিতে চায়, তাহাতে আপত্তি আমার কিছু নাই। তবে আমার নিকটে না করিলেই হইল। আমার অসুবিধা হইলে আমাকে আপত্তি করিতেই হইবে। কাল প্রথম দিন বলিয়া কিছু বলি নাই, আমাকে এখানে থাকিতে হইলেই এসব বেয়াদবি বন্ধ করিতে হইবে। এরূপ গোলমাল হইলে আমার বাবা এক ধমকে বন্ধ করিয়া দেন। কই তোমার বাবা ত তাহা করিলেন না ?

মনোলোভা। তা ভাই বউদিদি, এটা তোমার অন্যায় কথা। কালকের মত আমোদের দিনে কি কেও কাকেও ধমকায় ? কালকে গেছে যে অতি সুখের দিন।

রাজকুমারী। সেই জন্য কি অসুখের সূত্রপাত। কালকে ঘুমের ব্যাঘাত হ'য়ে আজ শরীরটা মেজ্‌মেজ্‌ করছে। আর দেখ না লোকগুলো

কত চেঁচিয়ে কথা কচ্ছে। তোমাদের এখানে কি মানুষগুলো আস্তে কথা কইতে জানে না।

হেমপ্রভা। বৌ, তোমার কথাগুলো সব অনাসৃষ্টি। তুমি কোথায় মানুষগুলোকে চেঁচিয়ে কথা কইতে শুনলে? তোমার ভাইয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই, তোমার বোনও আর নাই, যার বিয়ে হয়েছে; তাই তোমাদের বাটীতে বিবাহের কোন গোলযোগ দেখ নাই, বিবাহ কর্ম্মে যে একটু গোলমাল হয়, তা তুমি বুঝতে পারছ না। তা যা হো'ক আজ বউভাত, অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব আসিবে। আজও একটু গোলমাল হবে। তারপর আবার সব ঠাণ্ডা, কোন গোলমালই নাই, কোন ঝড়-বাতাস নাই, কোন ঢেউ-ধাক্কা নাই।

৬

"তাচ্ছল্যে তাচ্ছল্য আনে।"

পাঁচকড়ি সরকার, শেষ বয়সে পাঁচকড়ি রায় জমিদার, মহাশয়ের রাধানাথবাটীতে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। চারিপাশে ফাঁকা জমি, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রশস্ত সমতল জমি, তাহাতে কেবল সবুজবর্ণ দুর্ব্বাদল, আর মধ্যে মধ্যে এক এক স্থানে ছোট ছোট ফুলগাছের ঝাঁক। বাটীর চতুষ্পার্শ্বে ৪০০ ফুট পরিধির মধ্যে কোন বড় গাছ নাই, অধিকাংশই ফাঁকা জমি, তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশী ফলের গাছ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরদেশী শোভন গাছ—ঐ গুলিতে ফুল নাই, ফলও নাই, তবে আছে পাতার বিশেষ বৈচিত্র্য আর সেগুলি দেখিতেও বেশ সুন্দর। এ চারিশত ফুট পরিধির পরে বাটীর পশ্চাদ্ভাগে এক প্রকাণ্ড বাগান, তাহাতে সর্ব্বরকম জীবনতোষ ফলের বাগান—আম, গোলাপজাম, কালজাম, লিচু, কাঁঠাল, জামরুল, আপেল, আঁসফল, সফেদা, তুঁত, আকরোট, পীচ, ফলসা, বিলাতী আমড়া, বেল, কইত বেল, হরিতকী, আমলকী, পাস্তবাদাম। এই বাগানের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সরোবর সরোবরের চতুঃপার্শ্বে প্রথম দুই স্তবক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তালগাছ, তাহার পরেই কিয়দ্দূরে নারিকেল গাছ। সেগুলিও বেশ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপিত।

বাটীর দুই পার্শ্বে ফুলের গাছ—স্বদেশী ও পরদেশী সকল প্রকার ফুলের গাছ। প্রথমেই গোলাপ ফুলের গাছ, তাহার পরই অন্যান্য ফুলগাছ।

বিধবা ভগ্নীর দুরবস্থার কথা তাহার কানে পৌঁছাইতে চায়, অমনি সেও তাহাকে বলে, "ভাইহে, আমার ভগিনীর কথা বলিও না। সে যদি মানুষ হত, তাহলে আর ভাবনা কি! আমি দেশশুদ্ধ লোকের উপকার করিয়া আসিতেছি—আর এই একটা ভগিনীকে কি দেখিতে পারি না? তাহার কথা আর আমায় বল না—তাহার নাম শুনিলে মনে ঘৃণা ও রোষের উদয় হয়।" অথচ জনসমাজে সুযশঃ অর্জ্জন অভিলাষে হয়ত কোন এক "বিধবা আশ্রমে" যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা দিয়া খবরের কাগজে আপন নাম জাহির করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করে না। অনাথা বিধবা ভগ্নীর পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য একটী পয়সা দিতে রাজি নয়, অথচ অনাথ আশ্রমের জন্য এককালীন দুই টাকা চাঁদা দিয়া সংবাদপত্রে নাম জাহির করিতে বিশেষ তৎপর। এই শ্রেণীর লোকেরাই আবার নিজের প্রয়োজনের সময় অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় হস্ত প্রসারণ করে। যদি কেহ দিতে সম্মত না হয়, অমনি তাহারা গলাবাজি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ওঠে, দেশে ধর্ম্ম নাই, লোকের প্রতি সহানুভূতি নাই, সমাজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ইহাও সত্য যে, সে নিজে কখনও কাহারও উপকার করে নাই; অথবা উপকার করিবার ইচ্ছাও তাহার নাই। সে পৃথিবীর সমস্ত নির্গুণের আকর বলিলেই চলে। অথচ পরের ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত। সমস্ত দিন সমস্ত রাত পরের দোষ বাহির করা ও আপন গুণের ব্যাখ্যা করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরূপ একটিও বজ্রাহত উচ্চশির বৃক্ষ রায় মহাশয়ের বাগানে ছিল না। যদি কখন সেরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর মাত্রও দেখা দিত, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহারই স্থানে অন্য কোন সুবৃক্ষের বীজ বপন করিতেন। এক কথায় বলিতে গেলে রায় মহাশয়ের

বাগানে এক টীমাত্র আগাছা ছিল না। প্রতি বৃক্ষ, প্রতি গুল্ম ও প্রতি লতার কোন না কোন বিশেষ গুণ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এমন কোন লতা বা গুল্মের স্থান সেখানে ছিল না, যাহা রায় মহাশয় নিজে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না করিতেন।

রায়মহাশয়ের বাগানে খানিকটা জমী রন্ধনশালার উপযোগী, নানারূপ তরিতরকারি শাকসবজীতে বিশোভিত ছিল। বেগুনের জন্য প্রায় এক-বিঘা জমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। আলু বা পেঁয়াজের জন্য ২।৩ বিঘা জমি কর্ষিত থাকিত। আর তাহারই চারিদিকে ঝিঙ্গা, কুমড়া—দেশী ও বিলাতী, উচ্ছে, করলা, মানকচু, ওলকচু ও ওলের চাষের জন্য পৃথক পৃথক স্থান রাখা ছিল। দেওয়ালের ধারে ধারে পেঁপে, আনারস প্রভৃতি গাছে বাগানটী সুন্দররূপে বিশোভিত ছিল।

রায় মহাশয় পটলের বড় ভক্ত ছিলেন; সেইজন্য যতটুকু বালিমাটি ছিল, সমস্তটাই পটল চাষের জন্য আলাহিদা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন চীনের বাদাম, বিন, লঙ্কা, মটরসুটী প্রভৃতির চাষের জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। আর একখণ্ড জমি কেবল কপির জন্য পৃথক করা ছিল। তাহাতে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, প্রভৃতির চাষ হইত। তাহারই অদূরে শালগাম, গাজর, বীট, মূলা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এ সমুদয়ে যে কেবল রায়মহাশয়ের রন্ধনশালার সুবিধা হইত তাহা নহে। বাগানের শোভাও ইহাতে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নিকটস্থ প্রতিবাসীদের ইহাতে সুবিধা ছিল। রায়গৃহিণী প্রতিবেশীদের বখরা না দিয়া খাইতেন না। বাটীর হাতার ভিতর অনেকগুলি নিমগাছ ছিল। আর করমচা, মাদার, আমড়া, চালতা প্রভৃতি গাছেরও অভাব ছিল না। তাহারই অদূরে

কতকগুলি দাড়িম্ব বৃক্ষ ফলে ও ফুলে বাটীর ও বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

রায়মহাশয়ের কাছে কোন স্থানই বৃথা পড়িয়া থাকিতে পাইত না। এমন কি বড় বড় গাছের তলায় কোথাও বা হলুদ, কোথাও বা আদা, কোথাও বা আরারুট চাষের বন্দোবস্ত ছিল।

বাটীর কিয়দ্দূরে একখণ্ড প্রশস্ত জমি গমের চাষের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহা হইতেই রায়মহাশয়ের সংসারের আটা বা ময়দার সমস্ত অভাবই পুরণ হইত। তাহার উপরে অন্যান্য রবিশস্যের বন্দোবস্ত ছিল—মুগ, কলাই, অরহর, ছোলা, মশুরি, প্রভৃতি। এক কথায় বলিতে গেলে, সংসারের জন্য নিত্য যাহা প্রয়োজন,—ফল মূল, তরিতরকারি, ডাল, কলাই সমুদয়ই রায়মহাশয়ের নিজের জমিতেই উৎপন্ন হইত।

বাজারে খাঁটি সর্ষপ তৈলের অভাব; সুতরাং রায় মহাশয়ের ইচ্ছা, সর্ষপের চাষ করেন; কিন্তু রায় গৃহিণী এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। কাজেই রায়মহাশয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। রায় গৃহিণীর মতে বাস্তু ভিটার নিকটে সর্ষপের চাষ হইতে পারে না। অবশেষে রায়মহাশয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রামান্তরে সর্ষপ চাষের বন্দোবস্ত করিলেন। আর সেই জমির সন্নি-কটে একঘর কলুকে বসাইয়া একটী ঘানিগাছের বন্দোবস্তও করিয়া দিলেন। সুতরাং রায়মহাশয়ের সংসারে খাঁটি সরিষার তৈলের অভাব ছিল না। শুনা যায় যে বৎসর অধিক পরিমাণে সর্ষপ উৎপন্ন হইত, সে বৎসরে সেই গ্রামের কোন গৃহস্থেরই খাঁটি সরিষার তৈলের অভাব হইত না।

রায়মহাশয়ের মতে গৃহস্থমাত্রেরই গৃহে খাঁটি গোদুগ্ধের বন্দোবস্ত থাকা

সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ বিশুদ্ধ গোদুগ্ধই হিন্দুর স্বাস্থ্য রাখিবার একমাত্র উপায়। আর রায়গৃহিণীর মতে, গাভীর সেবা হিন্দু রমণীমাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। গাভী ভগবতী। যে গৃহস্থ গাভীর পরিচর্য্যা করিতে পারে না, তাহার জন্মই বৃথা। ইহার ফলে রায়মহাশয়ের বাটীর হাতার মধ্যে একটি সুন্দর গোশালার বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহার সংসারে দাস দাসীর অভাব ছিল না; কিন্তু গাভীর পরিচর্য্যার ভার রায়গৃহিণী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই গাভীগণের আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন—তাঁহার বাটীতে ভাতের ফেন এক ফোঁটাও নষ্ট হইতে পাইত না। সেগুলি বেশ সাবধানের সহিত রক্ষিত হইত এবং যথাসময়ে উহা গাভীগণকে খাইতে দেওয়া হইত। তরিতরকারীর খোসা নষ্ট হইতে পাইত না। ডাল, ডালের ভূষি, চালের কুঁড়া, সর্ষপতৈলের খৈল—সে সমস্তই গাভীগণের জন্য সুরক্ষিত হইত; এবং অবসর মত রায়গৃহিণী নিজে দাঁড়াইয়া সেই সমস্ত দ্রব্য গাভীগুলিকে খাওয়াইতেন।

আর যখন যে শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, তাহারই কতক অংশ গাভীগণের জন্য বরাদ্দ ছিল। এতদ্ভিন্ন রায় মহাশয় গাভীগুলির বিচরণের জন্য একটি সুবিস্তৃত মাঠ নবদূর্ব্বাদলে বিশোভিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।

সেই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে গাভীগুলি মনের সুখে সমস্ত দিন বিচরণ, করিত এবং অপরাহ্নে গোশালার মধ্যে স্থান পাইত। এই সুবন্দোবস্তের ফলেই, যে কয়টী গাভী রায়.গৃহিণীর গোশালায় ছিল, সেই সব গুলিই যেন কামধেনু। সংসারে খাঁটি দুগ্ধের ত অভাব ছিলই না, অধিকন্তু দধি, ছানা, ক্ষীর, নবনী, ঘোল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইত। আর মাঝে মাঝে রায়গৃহিণী স্বয়ং সেই দুগ্ধ হইতেই মুখরোচক ও পুষ্টিকর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বাগ্রে

দেব দেবীর পূজার জন্য উৎসর্গ করিতেন। এবং সেই প্রসাদ লইয়াই বাটীর সকলকে ভোজন করাইয়া নিজে তৃপ্তি বোধ করিতেন।

আজকালকার ভেলের দিনে খাঁটি জিনিষ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সংসারের ব্যবহারের জন্য কোন খাঁটি জিনিষ ত পাওয়া যায়ই না, বিশেষ অভাব খাঁটি মানুষের! দুগ্ধের পবিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণ বিশিষ্ট পানীয় জল। ঘৃতের পরিবর্ত্তে সাপের চর্ব্বি, সর্ষপতৈলের পরিবর্ত্তে বাদামের তৈল অথবা সোর গোঁজানির্য্যাষ, মাখনের পরিবর্ত্তে গমচূর্ণের সহিত শ্বেত প্রস্তর চূর্ণ বিমিশ্রিত—এই সমুদয় ভোজন করিয়া, এখনও যে বাঙ্গালী জাতির নাম ইহজগৎ হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। আর বাঙ্গালীর সমাজে আজকাল কয়জনই বা খাঁটি মানুষ মিলে। একেবারে দুষ্প্রাপ্য না হউক, অনেক সময়েই সেরূপ মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট। আমাদের মধ্যে আজকাল কেহ কেহ খাঁটি দ্রব্য পাইবার সুবন্দোবস্ত করিতেছেন বটে; কিন্তু খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করিবার বন্দোবস্ত কোথায়?

আমরা চাই স্বল্প মূল্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য। ফলে ভেল জিনিষই পাইয়া থাকি। তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমরা ছেলে মেয়ে মানুষ করিতে, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াই দায়িত্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। তাহাদের শিক্ষা কিরূপ ভাবে হইতেছে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমরা নিজে অধিক পরিশ্রম করিতে নারাজ, কাজেই আমাদের ছেলেমেয়েরাও এক অপূর্ব্ব জীবে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ ও সুশিক্ষার অভাবে তাহারা বিকৃত-মস্তিষ্কই হইয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হায়! কতদিনে আমাদের দেশের লোকেরা বিশুদ্ধ খাদ্য দ্রব্যের বন্দোবস্ত করিবেন জানি না, কিন্তু রায় মহাশয়ের সংসারে কোনও ভেজাল জিনিষই চলিত না। ফলে তাঁহার গৃহে সকলেই সুস্থ শরীরে ও মনের সুখেই দিন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার জমিগুলি সোণার খনি ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে সোণা ফলিত। যাহার ফলে তাঁহার সংসারের সকলেরই শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা নিজেরা ত সুখী ছিলেনই—এমন কি তাঁহাদের দাস-দাসী,—ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মাষ্টার, পণ্ডিত, সকলেই সুখে ছিল। অধিকন্তু প্রতিবেশীগণও তাঁহাদের উদারতার ফলে বেশ মনের সুখে ও সুস্থ শরীরে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ মাঝে মাঝে সকলেই ডালা পাইতেন।

রায় মহাশয়ের বসত বাটী একটী বৃহৎ অট্টালিকা। আর আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকেরই জন্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহের বন্দোবস্ত ছিল। বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহখানি ঠাকুর ঘর। সেই ঘরখানি রায়গৃহিণী নিজ হস্তেই পরিষ্কার করিতেন। দাসদাসীগণের প্রবেশ সে গৃহে নিষিদ্ধ ছিল। রায়মহাশয় নিজে একখানিমাত্র ঘর অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজকুমারী ও তাহার স্বামী মুক্তেশপ্রকাশের জন্য দুইখানি ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। আসলের চেয়ে সুদের আদর বেশী। একখানি শয়ন-গৃহ, অপরখানি বসিবার ঘর। রাজকুমারী শ্বশুর-বাটী আসিয়া অবধি অধিকাংশ সময়ে এই দুইখানি গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন। তিনি কাহারও সহিত মিশিতে চাহিতেন না এবং কাহাকেও নিজ কক্ষে আসিতে দিতে চাহিতেন না। অপর কেহ যে সে কক্ষে আসিবে, তিনি তাহাও বড় একটা

পছন্দ করিতেন না। এত বড় বাটীর মধ্যে অপর কাহারও প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। অধিকাংশ সময়েই একাকী নির্জ্জনে বসিয়াই কাটাইতেন। ননদদের কাছ হইতে তফাৎ তফাৎ থাকিতেন, আর অপর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেই চাহিতেন না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী না ডাকিলে বা তাঁহার কক্ষে না আসিলে তাঁহার সহিত বড় একটা সাক্ষাৎ করিতেন না; অপর আত্মীয়দের ত কথাই নাই। তাঁহার মনের ধারণা যে, তিনি রামবল্লভপুরের প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষানুক্রমিক জমিদার রামহরি ঘোষের একমাত্র কন্যা, সকলেই তাঁহার সেবায় ব্যস্ত থাকিবে, সকলেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে; আর তিনি হাসিয়া হাসিয়া তাহাদের সেবা গ্রহণ করিবেন। আর তাঁহার সেবা করিয়া তাহারা আপনা দিগকে ধন্য মনে করিবে,—বাস্, তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু কই! এখানে এ সকল বিষয়ের ত তেমন বন্দোবস্ত নাই; সুতরাং তিনি শ্বশুর-বাটীতে অতি মনোকষ্টেই ছিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাল এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী যখন দেখিলেন, রাজকুমারী গৃহের বাহির হন না, তখন তিনি অতি স্নেহের সহিত তাঁহাকে গৃহকর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া রামগৃহিণী হৈমবতী কতক পরিমাণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে তিনি মনস্থ করিলেন, যখন তিনি বাগান হইতে রন্ধনশালার উপযোগী তরিতরকারী, শাকসব্জী আহরণ করিতে বাহির হইবেন, তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পুত্রবধূ রাজকুমারীকে সঙ্গে করিয়া ডাকিয়া লইবেন। কিন্তু রাজকুমারী মাঝে মাঝে তাঁহার ডাক

প্রত্যাখ্যান করিতেন। কখন মাথা ধরিয়াছে বলিয়া কখন বা গায়ে ব্যথা হইয়াছে বলিয়া, একটা না একটা ওজর করিতেন।

এই বাটীতে হৈমবতীর এক বিধবা জ্যেষ্ঠভ্রাতকন্যা বাস করিতেন। তাঁহার নাম সত্যবতী। তাঁহার এক পুত্র ছিল, নাম হর্ষপ্রকাশ—বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। এই বিধবার অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল না; কাজেই তাহারা দুইজনে মাতাপুত্রে হৈমবতীর সংসারে থাকিত। আর এই বাটীতে থাকিতেন রায়মহাশয়ের এক বৃদ্ধা পিশি, নাম রামমণি। আর থাকিতেন তাঁহার এক বিধবা ভগ্নি শশীমুখী। আর অটলকুমার ও সনৎকুমার নামে তাঁহার দুই ভাগ্নেয়ও ছিল। বলা বাহুল্যমাত্র, হৈমবতী সকলকেই আদরের চক্ষেই দেখিতেন।

একদিন হৈমবতী সত্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, যাও ত দিদি একবার, বৌমাকে ডেকে দাও ত, আমি গোয়াল বাড়ীতে যাইতেছি, সেখানে বৌমা আমার সঙ্গে গিয়া খানিকটা টাট্‌কা দুধ খাইয়া আসিবে। আহা! ছেলে মানুষ, দিনরাত একলাটী ঘরের ভিতরে বসে বসে শরীর খারাপ কচ্ছে।

সত্যবতী হৈমবতীর আদেশ মত রাজকুমারীর গৃহে গিয়া বলিলেন, "বৌমা, বেলা ৩টা বেজে গেছে। হৈম গোয়াল বাড়ীতে যাবে, তাই ডাক্‌ছে।"

রাজকুমারী সবেমাত্র নিদ্রোত্থিতা হইয়াছেন, তখনও শরীরটা ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করিতে ছিল। আহারান্তে নিদ্রা গিয়াছিলেন, আর উঠিলেন বেলা তখন তিন্‌টে। সত্যবতীর কথায় একটু বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া শুইয়াই বলিলেন, তিনি যান ত যান না কেন,

আমি একটু পরে যাইতেছি। মনে মনে ভাবিলেন আমি গোয়ালবাড়ী গিয়া কি করিব, যে গোবরের দুর্গন্ধ। এখানে সবই উল্টা।

মনোলোভা পাশের ঘরে শুইয়াছিল, এই কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে রাজকুমারীর ঘরে আসিল এবং বলিল "বৌদিদি, এ তোমার কি রকম ব্যবহার, মা তোমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ওটা বাজিয়া গিয়াছে—আর তুমি কি না আলিস্যি করিয়া উঠিতে চাও না।"

রাজকুমারী।—তোমার যদি ইচ্ছা হয় তুমিই কেন যাও না?

মনোলোভা।—আমার যাইবার জন্য ত নয়! মা ডেকেছেন তোমাকে, তোমারই যাওয়া উচিত।

রাজকুমারী চুপ করিয়া গেলেন; মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার আপন মা ডাকিলেই বড় যাই। এ তোমার মা ডাক্‌ছেন। সুবিধামত যাব এখন, তাতে তোমার কি? (প্রকাশ্যে) আমি একটু পরেই যাইতেছি।

সত্যবতী আসিয়া হৈমকে বলিলেন, "বৌমা একটু বাদে আস্‌ছে," আর মনোলোভা বলিল, "তোমার আদরের বৌএর ফুরসৎ হ'লে তবে ত আস্‌বে?"

হৈমবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষ, না হয় একটু বাদেই আস্‌বে। মা মনো, তুমি বৌমাকে একটু বাদে নিয়ে এস, আর আমি সত্যদিদিকে সঙ্গে করে একটু এগিয়ে যাই।

মনোলোভা রাজকুমারীর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "এস বৌদিদি, মা ও বড়মাসি এগিয়ে গেছেন এখন আমরা যাই।"

রাজকুমারী।—তা ভালই হয়েছে, আর তুমিও কেন একটু এগিয়ে গেলে না? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

এইরূপ খানিকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর রাজকুমারী মুখ হাত ধুইলেন, আরসিতে নিজের মুখটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন, অবশেষে মনোলোভাকে বলিলেন, "নেহাৎ দেখ্‌ছি যেতে হবে, তবে যাই চল।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাগান বাটীতে গিয়া দেখিলেন, হৈমবতী ও সত্যবতী দুজনে লঙ্কা তুলিতেছেন। মনোলোভা রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া সেইখানেই আসিল আর বলিল, "বড়মাসি, তুমি ঢেঁড়স ক্ষেতে যাও, আমরা লঙ্কা তুলিতেছি। সত্যবতী চলিয়া গেল। তখন মনোলোভা লঙ্কা তুলিতে তুলিতে বলিল, "এস বৌদিদি, আমরা পাকা লঙ্কাগুলি গাছ হইতে তুলি।"

তিনজনে মিলিয়া খানিকক্ষণ লঙ্কা তুলিতে লাগিল। লঙ্কা তোলা হইলে হৈমবতী মনোলোভাকে বলিলেন "মনো, তুই বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে আয়, আমি গোয়াল বাড়ীতে যাচ্ছি।" এই বলিয়া হৈমবতী চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে রাজকুমারী গুটিকতক বেলফুল তুলিয়া লইলেন এবং শুঁকিতে শুঁকিতে বলিলেন "ফুলগুলার গন্ধ ত মন্দ নয়। তবে আমাদের বাড়ীর ফুলের কাছে দাঁড়াতে পারে না। সেগুলি যেমনই বড় হয়, তেমনি গন্ধে মাতোয়ারা।"

এমন সময় হঠাৎ কি যেন একটা রাজকুমারীর চোখে পড়িল। রাজকুমারী তাড়াতাড়ি চোখে হাত দিবার পরেই চক্ষু দুটি জ্বালা করিয়া উঠিল।

রাজকুমারী।—মনোদিদি, দেখ ত আমার চোখে কি পড়ল, ওঃ চোখ দুটো জ্বলে খাক হ'য়ে যাচ্ছে।"

মনোলোভা।—ওকি বৌদিদি, লঙ্কার হাত বুঝি চোখে দিয়েছ?

রাজকুমারী।—হ্যাঁ, সম্ভবতঃ তাহাই।

মনোলোভা।—তবে ত চোখ জ্বল্‌বেই!

রাজকুমারী মুখভার করিয়া বলিল, "তোমাদের যেমন কাণ্ড, থেকে থেকে লঙ্কা তোলার সখ জাগিল! তারই জন্যই ত আমার চোখ জ্বালা কর্‌চে।"

মনোলোভা।—সে দোষ আমাদের নয় বৌদিদি, তোমার নিজের বুদ্ধির দোষেই হয়েছে, লঙ্কার হাতটা চোখে দিলে কেন? এটাও কি শিখিয়ে দিতে হবে?

রাজকুমারী।—আমার বাপ মা যদি জানতেন যে তোমাদের এখানে এসে আমায় লঙ্কা তুল্‌তে হবে, তা'হলে বোধ হয় সেটা শিখিয়ে দিতেন।

মনোলোভা।—বৌদিদি, তুমি ভুলও করবে, আর চোখও রাঙ্গাবে? মা শুন্‌লে ব'লবে কি?

রাজকুমারী।—সত্য কথা ব'ল্‌বো, তা'তে আর বলাবলি কি?

মনোলোভা ইহার পর আর কিছুই বলিল না। তবে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—মা কি বউই ল'য়ে এসেছেন।

সেই রাত্রে মনোলোভা মাতার নিকট সকল কথাই বলিল, আরও বলিল, "দেখ মা, তুমি আদর দিয়ে দিয়ে বৌটার মাথা খেলে; অত আদর পেলে শেষে মাথায় চ'ড়ে ব'স্‌বে।

হৈমবতী।—তা মা আমার সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা বউ; যদি একটু আদরই দিই, তা'তে হ'য়েছে কি?

মনোলোভা।—আর আমারও ত দশটা নয় পনরটা নয়, দুইটী বোন। আমরাও জমিদারের মেয়ে, আমরা কি কখন এরকম আব্দার করি?

হৈমবতী।—তা মা, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান হয়?

হৈমবতী যদিও মেয়েকে একরকম বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু মনে মনে রাজকুমারীর কথায় একটু মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

আর একদিন হৈমবতী বাগানে গিয়া উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তুলিতেছিলেন, সঙ্গে ছিল সত্যবতী ও রাজকুমারী, একটা চাঙ্গারীতে উচ্ছে ও আর একটা চাঙ্গারীতে করলা জড় করা হইতেছিল। হঠাৎ রাজকুমারীর পায়ে ঠেকিয়া একটা চেঙ্গারী উল্টাইয়া গেল, আর অন্য চেঙ্গারীর একটা খোঁচ লাগিয়া রাজকুমারীর কাপড় খানকটা ছিঁড়িয়া গেল। সেই সময়ে মনোলোভাও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সত্যবতী রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৌমা, তুমি ত বড় অসাবধানী, জিনিষগুলা ফেল্‌লে কাপড়টাও ছিঁড়্‌লে!"

মনোলোভা। বৌদিদি আমাদের ঐরকমের, কেবল আড় আড় ছাড় ছাড়। কোন কাজই গুছিয়ে কর্‌তে পারে না। আজ দুবছর প্রায় বিয়ে হোয়েছে, এখনও কিছু কিছু শিখ্‌লে না, কে জানে আর কবে শিখ্‌বে?

হৈমবতী। তা সত্য দিদি, বৌমা আমার একটু চঞ্চলা বটে, তবে ছেলে মানুষ; ক্রমে শিখ্‌বে, ক্রমে শিখ্‌বে; সবাই কি আর পেট থেকে প'ড়ে শেখে?

মনোলোভা। আমরা শিখ্‌লুম কি কোরে? সময়ে ছেলে হ'লে দুছেলের মা হ'ত। আর শিখ্‌বে কবে? আমাদের পোড়া অদৃষ্ট, ভাইপো ভাইঝির মুখ দেখিতে এখনও পেলেম না, মা আমার বৌ বৌ ক'রেই পাগল। মার কাছে বৌয়ের কোন দোষই নাই। সকলের দোষ হতে পারে, বৌয়ের দোষ হবার নয়।

রাত্রে যখন মনোলোভা রাজকুমারীর ঘরে আসিল তখন দেখিল, রাজকুমারীর মুখ খুব ভার ভার। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিল, রাজকুমারী চটিয়াছে।

মনোলোভা। বৌদিদি হঠাৎ গ্রহণ লাগ'ল কেন? না জানি কোন রাহুতে আমার বৌদিদির চাঁদমুখখানি গ্রাস করিল!

রাজকুমারী। তোমাদের বাটীতে ত আর রাহুর অভাব নাই! আশে পাশে, চারিদিকেই রাহু!

মনোলোভা। সে কি বৌদিদি এত রাহু পেলে কোথায়?

রাজকুমারী। কেন? আজ বৈকালে তোমাদের আদরের মাসি আমাকে কি লাঞ্ছনাটা না করিল। জন্মে অবধি আমি কখনও এরকম লাঞ্ছনা ভোগ করি নাই। মা বাপ কি বুঝেই আমাকে এখানে বিয়ে দিয়েছেন?

মনোলোভা। সে কি বৌদিদি! এত রাগ কিসের? এত অভিমানই বা কিসের? আর বড় মাসি তোমাকে এমন কি বলেছেন যে তুমি এত রাগ কর্‌ছ!

রাজকুমারী। না, এমন কিছু নয়। কামড়ানওনি আঁচড়ানওনি, খুনও করেন নি, মাথাও কেটে ফেলেন নি।

মনোলোভা। তোমার সবই অনাসৃষ্টি, এত রাগই বা কিসের? সত্য মাসি এমন কি বলেছেন যে তুমি এত রাগ কর্‌ছ,—এই বলিয়া মনোলোভা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। রাজকুমারীও ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মনোলোভা তখনই রাগভরে তাহার মাতার কাছে গিয়া সমস্তই বলিল,

তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু রং চং করিতেও ভোলে নাই; ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর অনিচ্ছা করিয়াই হউক।

মা শুনিয়া মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণা হইলেন। একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলিলেন। সেই দিন হইতে একটু তফাৎ তফাৎ ভাব হইয়া গেল।

৭

পরের মেয়ে

আজ সাবিত্রী চতুর্দ্দশী। রায় মহাশয়ের বাটীতে মহাধুম, আনন্দের সীমা নাই। অনেক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ-কুমারীর সমবেত। আজ রায়-গৃহিণী হৈমবতীর সাবিত্রী চতুর্দ্দশীর ব্রত উদ্‌যাপন। ঠিক চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে হৈমবতী এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া হৈমবতী এই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসর উদ্‌যাপন—মহাধুম। ইহা হিন্দুদের একটী অতি পবিত্র ব্রত। সকল সৎকার্য্যেরই ফল আছে, কাজেই সাবিত্রী চতুর্দ্দশীরব্রতেরও ফল আছে; ফল—ব্রতী সাবিত্রী তুল্যা হয়। শাস্ত্রবিধি মত এই ব্রত গ্রহণ ও শুদ্ধভাবে উদ্‌যাপন করিতে পারিলে স্ত্রীলোককে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। রমণী এই ব্রত করিলে বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পা'ক আর নাই পা'ক, স্বামীকে ব্রতকালীন দেবতা নির্ব্বিশেষে পূজা করিতে হয়। কাজেই ব্রতের দিনে ও তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীর প্রতি ভক্তির বিশেষ উদ্রেক হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। স্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা রূপে পূজা ও তাহার সেবা করা কম ভাগ্যের কথা নহে। বিশেষ মুখরা রমণী যদি এই ব্রত গ্রহণ করে, অন্ততঃ কয়দিন তাহাকে জিহ্বা সংযত করিয়া থাকিতে হয়। তাহার পর আত্মীয় স্বজন সকলেই এই পূজার উৎসবে যোগদান করেন। আর স্ত্রীও পতিকে অন্ততঃ কতক সময়ের জন্য দেবস্থানে বসাইয়া তাঁহাকে পূজা করে। গুরু পুরোহিত ও অপরাপর

পণ্ডিতেরা, স্বামী যে সাক্ষাৎ দেবতা, সে বিষয়ে মত প্রকাশ করেন এবং ব্রতধারিণী রমণীকে সেই বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিতে থাকেন। আজ রায় মহাশয়ের গুরুদেব স্বয়ং তাঁহার বাটীতে উপস্থিত এবং তিনি রায় গৃহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন যে, যদি মর্ত্তে সর্ব্বসুখ উপভোগ করিতে চান, ও পরলোকে নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিতে বাসনা করেন, তবে অনন্যমনা হইয়া সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করুন, রায় মহাশয়কে দেবতার সমান দেখুন। পূজারি ঠাকুরেরও ঐরূপই কথা—অনন্যমনে স্বামীপূজা, এপারে সংসার সুখ ও ওপারে অনন্ত শান্তি।

শশীমুখী। বউ, দেখ খুব সাবধান, কোন রকমে যেন দাদাকে আজ ত্যক্ত করিও না, কোন রকম কথা-কাটাকাটী করিও না। আমি আজ সাতদিন থেকে তোমাকে এই কথাই বলিয়া আসিতেছি। মনের কোণেও কোনরূপে রায় মহাশয়ের প্রতি তাচ্ছল্য ভাবের স্থান দিও না।

রামমণি। বৌমা, তোমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে অতি অল্প। তুমি জন্ম জন্মান্তরে সাবিত্রীব্রত করিয়াছিলে, তাই আমার পাঁচকড়ির মতন সত্যবান্ স্বামী পাইয়াছ। তোমার বাটীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুয়েরই অনুগ্রহ। মনুষ্য জীবনে যাহা কিছু প্রার্থনীয় ও স্পৃহনীয়, তুমি তা সবই এ জীবনে পাইয়াছ। এখন এ জীবনে ভাল করিয়া স্বামীপূজা কর, পর জীবনে আবার সব সুখ পাইবে। নিজেও ধন্যা হইবে, আর অপরকেও ধন্যা করিবে।

সত্যবতী। না পিসিমা, না ছোট দিদি, আমাদের এমন রক্তে জন্ম হয় নাই। স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য আমাদের বংশে কখন হবার নয়। তবে যে হৈম আমাদের রায় মহাশয়কে একটু আধটু ধমক ধামক দেয়,

তাহা কেবল তাহাকে বশে রাখিবার জন্য ; কি জানি, কখন বা বেপথে যায়। এই দেখ না, আমি কখন রাগ ক'রে হর্ষের বাপের সঙ্গে হয়ত দুচার দিন কথাই কইতুম না। না হয় রাগ করে বাপের বাড়ী চলে যেতুম। একদিন সন্ধ্যা বেলায় বল্লুম্, আজ বাটী থেকে বেরুয়ো না। আমার কথা না শুনে সে বেরুলো। সেটা পৌষ মাস, আমি চুপ করে সব দেখলুম, গুম খেয়ে গেলুম, তার পর খেয়ে দেয়ে শুয়ে রইলাম। রাগে ঘুম হ'লো না। বলিলাম, কি, আমার কথা অগ্রাহ্য !—চুপটি ক'রে গুপটি খেয়ে পড়ে রইলাম। তাহার পর মনে করিলাম, এই আসে এই আসে। তা আসবার আর নামটি নেই। বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে শুন্‌ছি ঘড়িতে দশটা বাজ্‌ল, তারপর টক্ টক্ করে চলতে লাগল। কতকক্ষণ পরে যে এগারটা বাজল বলতে পারি না, বোধ হল যেন তিন চার ঘণ্টা পরে। তারপর আবার টক্ টক্—টক্ টক্—সে টক্ টকানির আর শেষ নেই। খানিক পরে একটা কালপেঁচা ডেকে গেল। আমার প্রাণটা চমকে উঠল। একি ! এযে অমঙ্গলের লক্ষণ ! তিনি বাহিরে রয়েছেন, এখন ঘরে এলে বুঝি, মা সুবচনি, তোমায় জোড়া হাঁস দোব মা, তাঁকে ভালয় ভালয় বাড়ী এনে দাও। প্রথমে রাগ হ'য়েছিল, তারপর আরও অধিক রাগ, তারপর পেঁচার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পাছে অমঙ্গল হয় সেই জন্য ভয়। তখন মনে হচ্ছিল ভালয় ভালয় ফিরে এলে হয়।

এই অবস্থায় খানিকটা জেগে থাকবার পর জুতার আওয়াজ পেনু। আমি চুপ ক'রে ভিট্‌কেল মেরে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে রহিলাম। সে ঘরে এসে কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে বল্লে "হাঁগো, খাবার কোথায় ?" উত্তরে কোন আওয়াজ না পেয়ে আলমারী হইতে ছেলেদের খানকতক বিস্কুট খেয়ে

আমার পাশে এসে শু'লো। দু একবার গায়ে হাতও দিলে, আমি মড়ার মতন পড়ে রইলাম। খানিকক্ষণ বাদ ঘুমিয়ে পড়ল। আমাকে জাগাবার বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া ঘুমিয়া পড়ায়, আমার মহারাগ হইল। আমি মনে মনে বল্লাম্—কি আমি সত্যবতী, নূতন নূতন যাহার একটা মিষ্ট কথার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিতে, তাহাকে এত অযত্ন এত তাচ্ছল্য! মাঝ রাতে এসে একবার ঘুম ভাঙ্গান পর্য্যন্ত নয়! কাজেই মহারোষ হ'য়ে গেল, একেবারে অগ্নিশর্ম্মা, শীতের রাতেও গা জ্বলতে লাগল। অমনি নীচে গিয়ে চৌবাচ্ছা হইতে এক কলসী জল আনয়ন, আর সেই কলসীশুদ্ধ জল রাগের ঝোঁকে নিজের গায়ে না ঢেলে, তার গায়ে ঢেলে দেওন। মিন্‌সে অমনি চরাৎ ক'রে লাফিয়ে উঠেল, না কোন কথা, না কোন বার্ত্তা,—মেঝের বিছানাটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গমন, অর্গল দেওন ও শয়ন। তাহার গায়ে জল ঢেলে তবে আমার গায়ের জ্বালা কমে গেল। আমি দিব্বি ঘুমিয়ে পড়লুম। তার কয়দিন পরে শুনিলাম, সে রাত্রে তাহার বিশেষ কষ্ট হ'য়েছিল।

শশীমুখী। সত্যদিদি, তুমি ত খুব ভালমানুষ ছিলে দেখ্‌ছি, দাদাকে খুব বিভোর ক'রে রেখেছিলে।

সত্যবতী। তা বোন, আমি অন্যায় কথন সহ্য কর্‌তে পারি নাই। অন্যায় কার্য্য সকল সময়েই আমার অসহ্য। আমারও বুঝি না, বোনেরও বুঝি না, স্বামীরও বুঝি না, শাশুড়ীরও বুঝি না, ননদেরও না। একদিন আমার এক মাসী তোমার দাদার নিন্দা করেছিল, আমি আর সেদিন আহার করিলাম না। মাসীর সঙ্গে কথা কহিলাম না। আমার কথা কি জান, আমার ত সাতপেকে কেনা জিনিষ, মারতে হয় মারুক্, কাটতে

হয় কাটুক, সে আমার, যা ইচ্ছা তাই করব, তা ব'লে অন্য লোকে তাহার নিন্দা করবে, তা আমার সহ্য হবে না। আর সেও সে কথা জানত; সেইজন্য কখন কিছু বিশেষ রাগ করত না।

শশীমুখী। তা দিদি, সাতপেকে কেনা জিনিষ কি রকম?

সত্যবতী। শশী, তা আর বুঝলিনি, আমি তাকে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে সাতপাক দিয়ে কশে বেঁধে ল'য়েছিলাম, সে অবধি আর নড়ন চড়ন নাই। সাত পাক দিয়ে বেশ ক'রে দেখে শুনে তবে কিনেছিলাম।

শশীমুখী। সত্যদিদি, তোমার পায়ে দণ্ডবৎ—তোমার পেটে এত বুদ্ধি।

রামমণি। আরে শশী, আজ কালকার ছোঁড়াছুঁড়ীরা আমাদের বুড়োবুড়াকে মাংসপিণ্ড জড়বৎ মনে করে। মনে করে বুড়ো বুড়ীরা বোকা, হাবা, গোবা, তাদের প্রাণে রসকস কিছুমাত্র নাই। তাহারা একেবারে মাংসপিণ্ড, আর এই রকমই বুঝি তারা বরাবরই ছিল, প্রাণহীনা, জ্ঞানহীনা। কিন্তু সেই বুড়াবুড়ীরও প্রাণ ছিল, তাদের ধমনীতেও যে একসময়ে তপ্ত শোণিত বহিত, তাহা ছোঁড়াছুঁড়ীরা কখন বুঝতে পারে না।

আর বুড়াবুড়ীদের বলি, তাহারা এখন ৭০ বা ৮০ বৎসর পৃথিবীতে থাকবার পর, ৫০ বৎসর আগে তাহারা কি ছিল, তাহা একেবারে ভুলে গেছে। পঞ্চাশ বৎসরের আগের গল্প বলে, ঘটনা ব্যাখ্যান করে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে তাহাদের প্রাণের আবেগ ও উচ্ছ্বাস তাহারা একেবারে ভুলে যায়। এরূপ সম্পূর্ণভাবে ভুলে যে, সে উচ্ছ্বাস সে আবেগ অপরের প্রাণে দেখলে, তাহাদের পূর্ব্বকথা মনে পড়ে না, পূর্ব্বের উচ্ছ্বাস বোধগম্য করতে পারে না।

সত্যবতী। সেইটিই বৃদ্ধবৃদ্ধার প্রতি ভগবানের অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ।

রামমণি। আমার বিশ্বাস কি জান, যখন আমরা প্রথম জন্মগ্রহণ করি, তখন ভগবানের সাক্ষাৎ নিকট হইতে আসি। ক্রমে যত এখানে বেশী দিন থাকি, ততই ভগবানের মহিমা ভুলিয়া যাই। ভগবান চান, আমরা সকলেই, তাঁহার সকল সৃষ্ট জীবই, সুখে ও আনন্দে কালাতিপাত করি। সকলেই প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে জীবনযাপন করি। এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই, আমরা সকলেই ভগবানের সৃষ্ট। সেই এক স্থান হইতে সকলেই আসিতেছি। সকলের স্রষ্টা এক, সকলেরই রক্ষক এক, আর সকলকেই যে একস্থানে যাইতে হইবে—একথা একেবারেই আমাদের মনে থাকে না। আমরা পরস্পর পরস্পরকে সুখী করি, পরস্পরে পরস্পরকে শান্তিপথে লইয়া যাই, ইহাই যে ভগবদিচ্ছা, ইহা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। তাই যত গণ্ডগোল। তা নহিলে নব পরিণীতা বধূ আসিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কাছে মনের আনন্দে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে দোষের রেখা দেখি কেন? আর শ্বাশুড়ী নিজ কন্যাকে এক চক্ষে দেখেন, আর অপরের কন্যা, পুত্রবধূ, যে তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র প্রাণপ্রতিম পুত্রের সুখের ও আনন্দের কেন্দ্র, তাহাকে অন্যচক্ষে দেখেন। ইহা কি বিশেষ অস্বাভাবিক নয়?

শশীমুখী। তা সে সব কথা এখন রাখ, চল পূজার আয়োজন করা যা'ক।

হেমপ্রভা। পিসিমা, মাসীমা, তোমাদের মা ডাকছেন।

শশীমুখী। চল মা যাচ্ছি।

মনোলোভা। দিদিমণি আমি পুজো হ'লে সাবিত্রী ব্রতকথা শুনিয়া তবে জল খাব, তার আগে নয়।

হেমপ্রভা। আমিও ভাই ভাই।

মনোলোভা। বউদিদি কি করবে ?

হেমপ্রভা। সে বল্‌লে, উপোস্ টুপোস্ আমার দ্বারা হবে না, মিছা-মিছি অনিয়ম করে অসুখ ডেকে আনব কেন ?

মনোলোভা। বউদিদির কি বুদ্ধি! উপোস কল্লে মানুষের অসুখ করে, না মানুষ মরে!

হেমপ্রভা। তোদের জামাইবাবু সেদিন বল্‌ছিল যে, আজকালকার ডাক্তারদের মত, মাঝে মাঝে উপবাস, স্বল্পাহার সুস্থ শরীরের পক্ষে খুব ভাল। কবিরাজদের মতও ঐরূপ পূর্ব্ব হইতেই আছে। এখন ডাক্তাররাও কবিরাজ-দের সহিত একমত। তাই দেখ না, আমাদের দেশে বিধবা স্ত্রীলোকেরা, যাহারা অতিশয় স্বল্পাহারী ও মাসে ৭।৮ দিন উপবাসী, তাহারাই অধিক দিন বাঁচেন।

মনোলোভা। মনে আছে, সেদিন ডাক্তার দাদা বল্‌ছিলো যে, অধিক আহারই অধিকাংশ লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। না খাইয়া যত লোক মরে, তাহার চেয়ে অধিক খাইয়া বেশী লোক মরে। সাহেবদের মধ্যে জ্ঞানী লোকেরা বলে নিজের খাবারের কাঁটা চামচ ও ছুরিতে যত লোক আত্মঘাতী হইয়াছে, নরঘাতীর ছুরিতে তত লোক মরে নাই। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং। সর্ব্ব জিনিষেরই অধিক মাত্রাই খারাপ।

আজ জন্মাষ্টমীর দিন। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। এই দিনে অত্যাচারী কংসরাজের ধ্বংসের জন্য স্বয়ং নারায়ণ নরদেহ ধারণ করিয়া ইহ-জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ জগতে সর্ব্ব পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল, মানুষের জীবনগতিও সেইরূপ। যখন মানুষের গতি অতিশয় পাপ-পথগামী হয়, তখনই তাহার গতির শেষ হয়, পরেই তাহার ধ্বংস হয়। যখন কংস

রাজার অত্যাচার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, স্বয়ং ভগবান দেখিলেন, তাহার পাপগতি রোধের প্রয়োজন। তাহার পাপের শাস্তির জন্য, আর জন সাধারণের শিক্ষার জন্য, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥"
গীতা। ৪র্থ অধ্যায়।

তাঁহার অবতীর্ণ হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে গেলে ভক্তি চাই।

"ভক্তিতে পাইতে পার তর্কে বহুদূর।" ঈশ্বরবোধ তর্কে কখন হয় না, ভক্তিতে হইতে পারে। ভক্তি বলে ভগবদ্‌বাক্য বোধগম্য হইলে ভগবানের প্রসাদ পাইতে পার, নতুবা নয়। সেই ভগবদ্‌প্রসাদের অধিকারী হইতে হইলে ভগবানে ভক্তি চাই। সেই ভক্তির উদ্রেক করিতে হইলে তাঁহার প্রতি মতি প্রয়োজন। অনন্যমনে তাঁহার ধ্যান করিতে হইলে ষড়রিপু সম্বলিত নিজ রক্তমাংসের শরীরকে একাগ্রমন করিতে হইবে, তবে ভগবদ্ধ্যান সম্ভব। আর সেই ভগবদ্ধ্যানের জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হইলে, পরমপিতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে উপবাস করিয়া মন সংযত করিতে হইবে। অতএব ভক্তের পক্ষে এই জন্মাষ্টমী এক মহা আনন্দের দিন।

আজ হৈমবতী মহা ব্যস্তা। তাঁহার সেদিনের মনের ভাব—যেন ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহার গৃহেই জন্মগ্রহণ করিতে আসিতেছেন। রায়মহাশয়ের মনের ভাবও তদ্রূপ। সে দিনে তিনি কোন অন্যায় কার্য্য করিতে নিতান্ত

নারাজ। এমন কি, বাকী দেনার সুদ সে দিনে তিনি একেবারেই গ্রহণ করেন না। তাঁহার নায়েবকে বলা আছে, সেদিন কেহ বাকী খাজনা দিতে এলে সুদ নেবে না। প্রজাকে সে দিনের তরে পীড়ন করিবে না, আনন্দ দিবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দময়।

গতকল্য হৈমবতী হুকুম জারির করিয়াছেন যে বাটীর সকলকে আজ জন্মাষ্টমীর উপবাস করিতে হইবে। তাঁহারা নিজে স্ত্রীপুরুষে, রামমণি, শশীমুখী, সত্যবতী, হেমপ্রভা, মনোলোভা, মুক্তেশপ্রকাশ, রাজকুমারী আর আর বাটীর সকলেই উপবাস করিবেন। মনোলোভা মায়ের হুকুম রাজকুমারীর কাছে গিয়া জ্ঞাপন করিল—বলিল—"মা বলিয়াছেন, তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে উপবাস করিতে হইবে।"

হেমপ্রভাও মনলোভার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল।

হেমপ্রভা। বউদিদি, তোমায় কাল উপবাস করিতে হইবে। কালকে জন্মাষ্টমী ব্রত।

রাজকুমারী। কেন আমার উপর এ কড়া হুকুম? শুধু শুধু, সুস্থ শরীরে উপবাস কেন?

মনোলোভা। শুধু শুধু আবার কি। জন্মাষ্টমীর দিনে আমাদের এখানে ছেলে বুড়ো সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে উপবাস কর্‌তে হয়। খুব ছোট ছেলে মেয়ে ছাড়া সকলকেই উপবাস করিতে হইবে। কেন তোমাদের রাঘববলপুরে কি এ নিয়ম নাই?

রাজকুমারী। রাধামাধব! আমাদের ওখানে বিনা কারণে শরীরকে কষ্ট দেবার প্রথা একেবারেই নাই। শুধু শুধু উপোস তিরেস কেন বোন্? বলি ১ বৎসরে ত মোটে ৩৬৫ দিন, বাঁচবে ত মোটে পঞ্চাশ কি

ষাট বৎসর, তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে যদি বিনা কাজে আহার ত্যাগ করিবে, তবে খাবে কবে? ভোগ কর্‌বে কদিন?

হেমপ্রভা। তবে মাথা ধরেচে ব'লে মাঝে মাঝে যে খাওয়া বাদ দাও তাহার কি?

রাজকুমারী। সে ত অসুখের জন্য, শরীর অসুস্থ থাকিলে খাদ্য দ্রব্যে রুচি থাকে না, সেই জন্য খাইতে ভাল লাগে না, খাইলে আরো অধিক অসুস্থতা আনে।

মনোলোভা। আর মাঝে মাঝে পূজা পার্ব্বনের দিনে ভগবানের নাম করিয়া তাঁহার উদ্দেশে উপবাস কর, তবে আহার ঔষধ দুই হবে। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে ভগবানের নামে উপবাস, কাজেই কোন কষ্ট হবে না আর মাঝে মাঝে উপবাস দিলে শরীরের রসও মরে যায়, শরীর খট্‌ খটে হ'য়ে যায়।

হেমপ্রভা। বউদিদি, আমরা ১০।১১ বৎসর বয়স হইতেই জন্মাষ্টমীর ব্রত ও উপবাস করিয়া আসিতেছি, কোন কষ্টই হয় না, বেশ আমোদে সময় কেটে যায়। কথায় বলে, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। অভ্যাস, অভ্যাস, অভ্যাস। অভ্যাস করিলে শারীরিক কোন কষ্ট নেই। কথায় বলে, অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চচ্চড় করে। অভ্যাস না থাক্‌লে একটী চন্দনের ফোঁটা মাত্র কপালের কষ্টজনক হয়। সেই কারণে বাল্যাবস্থা হইতেই আমাদের হিন্দুর ঘরে বারব্রত অভ্যাস করাই থাকে।

রাজকুমারী। আমাদের বাটীতে ও সব ঝঞ্ঝাট নেই, ও সব গোলযোগ নেই; কাজেই আমাদের কোন অসুবিধাও নেই।

মনোলোভা। গোলযোগ বা অসুবিধা কি তা ত বুঝতে পাল্লেম না। এ সব বারব্রতে আমোদ আছে, পুণ্য আছে, আনন্দ আছে।

রাজকুমারী। আমার উপবাসেও কাজ নেই, আর পুণ্যাতেও কাজ নেই।

মনোলোভা। ব্যারাম হ'লে রোগী কি ঔষধ খাইতে শীঘ্র রাজি হয়! রাজি বা গররাজি,—তাহার আরোগ্যের জন্য, তাহাকে ত ঔষধ খাওয়াইতেই হইবে। আমাদেরও তোমাকে লইয়া তাই।

রাজকুমারী। ব্যস্, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ব্যস্! তোমাকে আর দুই হাত টিকি গুচ্ছ ল'য়ে কথকতা কর্‌তে হবে না। আমার ওসব ভাল লাগে না। আমি ও সব কর্‌বো না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে লাভ কি?

হেমপ্রভা। চিনি ইচ্ছাতেই খাও, আর অনিচ্ছাতেই খাও, মিষ্টি লাগিবেই। তোমাকে পুণ্য কার্য্যে ব্রতী করাইতে পারিলে আশু তোমার ভাল লাগ্‌তে না পারে, ক্রমে ইহার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

রাজকুমারী। তোমরা যত আনন্দ পাও, তা সে সবের কি আমাকে বখরা দাও!

হেমপ্রভা। আমাদের স্বভাব কেবল ভাল পেলে একা খাই না, সকলকে বখরা দিয়ে খাই, তাহাতে আনন্দ বেশী।

রাজকুমারী। থামুন, ধর্ম্মযাজক মহাশয় থামুন।

মনোলোভা। তা যাই হোক্, আজ নিরামিষ আর কাল উপবাস। শুন্‌লেন পেটুক মহাশয়, মার হুকুম।

রাজকুমারী। এ হুকুম নয়, এ জুলুম।

মনোলোভা আসিয়া সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাতাকে বলিলেন। শুনিয়া মাতা বলিলেন, তা বাপু ছেলে মানুষ, জোরজবরদস্তিতে কাজ নেই, যখন বয়স হবে আপনি বুঝতে পার্ব্বে, হাজার হোক ছেলে মানুষ।

মনোলোভা। হাঁ, বৌদিদি ত ছেলে মানুষ বটেই, আর চিরকাল ছেলে মানুষই থাক্‌বে। মার এক কথা—ছেলে মানুষ। মা, আমরা ত এর চেয়ে ছেলে মানুষ ছিলাম, যখন প্রথম বার ব্রত উপবাস আরম্ভ করি। তুমি ত বল্‌তে হিন্দুঘরে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের বেলা একমত, আর আদরের বউটির বেলা আর একমত।

হৈমবতী। (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) তোরা যে আমার পেটের মেয়ে। তোদের উপর যতটা দাবী, তোর দাদার উপর যতটা দাবী, বউমা,—পরের মেয়ে, তার উপর কি আমার ততটা জোর চলে? মনোলোভার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—বোকা মেয়ে।

মুখে এইরূপ বলিয়া কথাটা ধামা চাপা দিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন। এতদিনের পর তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে এই কথা প্রতিফলিত হইল যে, পুত্রবধূ অতি আদরের হইলেও, সে "পরের মেয়ে"। কন্যার উপর যেরূপ জোর চলে, পুত্রবধুর উপর সেরূপ চলে না। তাই হৈমবতী কি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন "সে যে পরের মেয়ে"।

আজ তিন বৎসর হইল, রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে তিনি ৪।৫ বার রাধানাথ-বাটীতে আসিয়াছেন। তবে যত সময় যাইতে লাগিল, ততই মুক্তেশপ্রকাশ হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, রাজকুমারী তাঁহাকে কতকটা অনাদর করেন; তাঁহার ব্যবহারে বুঝা যায় যে, তিনি যেন মনে করেন, যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হয় নাই; মুক্তেশপ্রকাশ রাজকুমারীর সম্যক্ উপযুক্ত নন।

মুক্তেশপ্রকাশ প্রথম প্রথম, রাজকুমারী ছেলেমানুষ সেইজন্য এরূপ হইতেছে, এই মনে করিয়া তাঁহার এরূপ ব্যবহারে কিছু দোষ ধরিতেন না।

কারণ পর-ছিদ্রান্বেষণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকুমারী তাঁহাকে বাস্তবিকই তাঁহার অপেক্ষা হীন মনে করেন। এই কারণে তিনিও তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে দুজনের মধ্যে স্পষ্ট তফাৎ-তফাৎ ভাব বুঝা যাইতে লাগিল।

মুক্তেশপ্রকাশ চরিত্রবান্ যুবা-পুরুষ। চরিত্রবান্ হইলেও যুবক। এদিকে তাঁহার স্ত্রী সাক্ষাৎ হইলেই আপন ঔদ্ধত্যের দ্বারা স্বামীকে তফাতে রাখিতে লাগিলেন। তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াই বিভোরা, প্রত্যেক কর্ম্মে দেখাইতে চান যে তিনি স্বামী অপেক্ষা উচ্চ। স্বামী সে ভাব একেবারেই পছন্দ করিলেন না। কাজেই তিনি বহির্বাটীর বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্ধব লইয়াই বেশী সময় কাটাইতে লাগিলেন। রাজকুমারীও আশ্চর্য্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন, স্বামী তাঁহাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় চোখের মণির মত দেখেন না, একটু তফাৎ-তফাৎ ভাব বেশ বিদ্যমান। ফলে দুজনে দুজনার কাছ হইতে অন্তরে রহিতে লাগিলেন। ফল দুজনেরই মনঃকষ্ট, দুজনেরই মনোবেদনা, দুজনেরই অশান্তি; কেহ কাহাকেও খুলিয়া আসল হাল বলেন না; দুজনেই গুমরিয়া গুমরিয়া জ্বলিতে লাগিলেন।

৮

ছেলেমেয়ে কেনাবেচার জিনিস নয়

রামচরণ মিত্রের বাস ভট্টপল্লীতে। সেখানে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুপমা বিবাহ-বয়স্কা।

মিত্রজা মহাশয় বিদ্যানুরাগী ও ধর্ম্মানুরাগী; সর্ব্বাপেক্ষা সৎসঙ্গেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। তিনি অবসর পাইলেই বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে আসিয়া বসিতেন, আর তাঁহার সহিত সদালাপ করিতেন। তিনি পাণ্ডিত্যের যে বিশেষ অনুরাগী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এবং সেই অনুরাগটি কার্য্যে লাগাইতে বিশেষ উৎসুকও ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি যদি আমাদের সাংসারিক সুখের সোপান স্বরূপ না হইল, তবে সে বিদ্যাবুদ্ধির ফল কি? তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, অধর্ম্মে সুখ হয় না, অন্যায় করিয়া লোকে সুখী হইতে পারে না। জীবনে সুখ শান্তি পাইতে হইলে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে হইবে। কোন কার্য্যে উন্নতি করিতে হইলে সৎপথের আশ্রয় স্পৃহনীয়; ধর্ম্মপথের আশ্রয়ই সুখের মূলভিত্তি—এ জগতেই হউক আর পরজগতেই হউক। গন্তব্যপথ—এক—এ জীবনেই হউক আর পরজীবনেই হউক। যদি সুখ চাও, যদি শান্তি চাও, যদি মোক্ষ চাও, ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিতেই হইবে। আমাদের প্রধান ভুল, আমরা মনে করি, এ সংসারে সুখের অধিকারী হইতে হইলে অধর্ম্মের আশ্রয় করিতে কোন ক্ষতি নাই; বিশেষ একটু

আধটু ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলেও তাহাতে সুখের কোন অন্তরায় হয় না। মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়া নিজের একটু অধিক সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে, তাহাতে কোন দোষ নাই, বরং তাহা তোমার নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। যেস্থানে যে অবস্থায় থাক, সুখের পথ এক। পরকে সুখী করিতে পারিলে তবে তুমি নিজে সুখী হইতে পারিবে, অপরের সুখ তোমার উপর প্রতিফলিত হইবে।

বাচস্পতি মহাশয় শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা এই সব ধ্রুব সত্য মিত্র মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতেন, আর মিত্র মহাশয়ও সেই সব শুনিয়া বুঝিয়া ও শিক্ষা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি প্রত্যহ বিষয়কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া যত না সুখবোধ করিতেন, বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রোপদেশ পাইয়া জীবনের গন্তব্য পথ ঠিক করিবার অবসর পাইয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইতেন। তিনি কয়েক দিবস ধরিয়া বিষয়কার্য্য করিয়া সাংসারিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন, আর মাঝে মাঝে এক একদিন বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া মনকে আবার কর্ত্তব্য বিষয়ে দৃঢ় করিয়া লইতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া যাহা শিক্ষা করিতেন, সেই শিক্ষা তাঁহার সাংসারিক কার্য্যের মাপকাটি হইত, এবং তাঁহার প্রাত্যহিক গৃহকার্য্যের সহায়তা করিত। মিত্রজা মহাশয় ভূরি ভূরি অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষলাভ অধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া জানিতেন। তাই সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাস, যাহা পর জগতের পক্ষে ভাল, তাহাই এ জগতের পক্ষে ভাল। যাহা ভাল, তাহা দুই স্থানের পক্ষেই ভাল। স্বতন্ত্র ব্যবহার সর্ব্বসময়ে বর্জ্জনীয়।

এক দিবস দুইজনে বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন হরকুমার রায়। হরকুমার আজকালকার হাল আইনের মতে শিক্ষিত। সমাজে তাঁহার খ্যাতি আছে; কেন না, তাঁহার কিছু অর্থ আছে। অর্থের মাপকাটি অনুসারে তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহার ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন; চারিটি পুত্র সন্তান। তাঁহার কন্যারত্ন ছিল না বলিয়া তিনি একটি কন্যারত্নের আগমনের জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন; অধিক উৎসুক ছিলেন রায়গৃহিণী। ভগবান সর্ব্বসুখ মানুষকে দেন না; রায়মহাশয় ও রায়গৃহিণী কন্যারত্ন লাভে বঞ্চিত হইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে বাচস্পতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে মিত্রজা, অনু'র বিবাহের কি হইল? পাত্র ঠিক হইল কি? দেখ বাবু, মুস্কিল আজকাল সমাজের রুচি লইয়া। সকলেই বাহ্য চাকচিক্যে মাতোয়ারা। কুলের আর আসল গুণের আদর নাই,—আদর বাহ্য চটকের। আচ্ছা মিত্রজা, তোমার ত পয়সা আছে, তোমার পাত্র পাইতে এত বিলম্ব কেন?"

রামচরণ। বাচস্পতি মহাশয়, আজকালকার সামাজিক অবস্থায় কন্যাদায় সকলকার, বিশেষ আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে। আমাদের কায়স্থের ঘরে পাত্রের সংখ্যা অনেক সত্য; তবে মুস্কিল কি জানেন, "বাঁশবনে ডোম কাণা"। হিন্দুর ঘরে একবার বিবাহ হইলে আর ত ফিরিবার নয়। ভালই হউক আর মন্দই হউক, চিরজীবনের জন্য বন্ধন রহিয়া গেল। একবার সাতপাক ঘুরিলে তাহা আর খোলে না। এরূপ অবস্থায় দেখে শুনে পাত্র স্থির করা বড় বিষম সমস্যা। আর পয়সার কথা যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক নয়। আমার যা পয়সা আছে, তাহাতে বুঝে সুঝে চালালে খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না সত্য। ব্যারামে, আরামে, বিপদে, সম্পদে এক

রকমে চ'লে যাবে। তবে আমি যদি নিজেকে মহারাজ কর্পূরতালার সমতুল্য মনে করিয়া জামাতাকে একখানা জমিদারী কিম্বা তদুপযুক্ত যৌতুক দিয়া ক্রয় করিতে যাই, তাহা হইলে জীবদ্দশাতেই আমাকে পরের কাছে হাত পাতিতে হইবে; হয়ত আমার গৃহিণীকে তাহার ভাজের মুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিতে হইবে। কন্যার জন্য এত অধিক মূল্যে সুপাত্র কিনিবার আমার সামর্থ্য নাই। আমার তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। পুত্রদিগকে সুশিক্ষা দিতে হইবে, কন্যা দুটিকে সুশিক্ষা দিতে হইবে, সুপাত্রে ন্যস্ত করিতে হইবে। আমার যা অর্থ আছে, হুঁসিয়ার হইয়া চলিলে বিনা কষ্টে সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে; নতুবা পুঁটে নবাবী করিলে তিন দিনে ধাই-ফুট ফাট হইয়া যাইবে। দেখুন বাচস্পতি মহাশয়, আমার বাপদাদাকে দশজনে চিনিত, মানিত। তাঁহারা আমাকে রাখিয়া, তাঁহাদের মান ইজ্জত আমার হাতে গচ্ছিত রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমার ছেলেমেয়েরা তাঁহাদের তরফ হইতে আমার নিকট সেই গচ্ছিত সম্পত্তি সব ফিরাইয়া লইতে হাজির। তাহাদিগকে সে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে হইবে, আসল মায় সুদ। তবে সব দিক্ বুঝিয়া সুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

বাচস্পতি। তোমার মেয়েটিকে ত রন্ধনকার্য্যে বেশ সিদ্ধহস্তা করিয়াছ। সেদিন ব্রাহ্মণী ব'লছিল, দেখ গো, আমাদের অনুপমা সাংসারিক কার্য্যে বেশ সুদক্ষা, রন্ধনকার্য্যে বিশেষ পটু, সীবন-কার্য্যে অতি সুনিপুণা, বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে পারে; সংস্কৃত ও ইংরাজি কিছু কিছু জানে, দেবদেবীর স্তোত্রগুলি অতি মধুর ভাবে আবৃত্তি করিতে পারে, কালীকীর্ত্তন, রামায়ণ, মহাভারতের সুমধুর গানে বাটীর সকলকে মোহিত করিতে পারে।

সে আমার মেনকার অতিশয় অনুরক্তা। মেনকা আমার এখানে আসিলে সে প্রায়ই আমাদের এখানে থাকে। আহা, এমন পাত্রীর যে পতি হইবে, সে পুরুষ অতিশয় ভাগ্যবান্। তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ অতি বিরল।

রামচরণ। বাচস্পতি মহাশয়, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি বিশেষ যত্ন করিয়া আমার কন্যাটিকে সুশিক্ষিতা করিয়াছি। কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিতে হইলে কেবলমাত্র তাহাকে লিখিতে পড়িতে শিখাইলে হইবে না, যাহাতে সে ভাল গৃহলক্ষ্মী হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে। রন্ধনকার্য্যে পটুতা ভাল গৃহিণীর পক্ষে এক প্রধান লক্ষণ। চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, মাছ, তরিতরকারী সবই তোমার রহিয়াছে, অথচ তুমি ভাল রন্ধনকার্য্য না জানিলে সেইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে তোমার রসনাতৃপ্তিকর করিতে পারিবে না। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! তোমার নিকট রন্ধনের উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই মজুত, অথচ তোমার রন্ধন-কার্য্যে অনভিজ্ঞতাহেতু সেগুলিকে ব্যবহারে আনিতে পারিবে না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? আমার গৃহস্থের মেয়ে, তাহাকে বাইজি সাজাইবার প্রয়োজন আমার একেবারেই নাই। তাহাকে গৃহলক্ষ্মী প্রস্তুত করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, স্বামীর হৃদয়ের অধিকারিণী হইতে হইলে, তাহার পেটের ভিতর দিয়া গিয়া হৃদয় জয় করিতে হইবে। ভাল ভাল খাদ্য রন্ধন করিয়া স্বামীর রসনেন্দ্রিয় জয় কর, তাহা হইলেই তাহার হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইবে,—কিছু দিনের মধ্যে তাহার হৃদয়েশ্বরী হইবে। "ভাল রসদ দানে আমরা ভুবন জয় করি।" স্ত্রীলোকেরা ভাল রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া সকলকে জয় করিবে। প্রত্যেক মহিলারই রন্ধনে সৈরিন্ধ্রী হওয়া চাই। তাহা হইলে সাংসারিক সুখের

মূলভিত্তি প্রোথিত হইল। স্বামী অবস্থাপন্ন হউন, একটা কেন পাঁচটা পাচক পাচিকা রাখুন না কেন, তাহাতে আপত্তি নাই; তবে স্বামী, পুত্র, আত্মীয়স্বজনের ও অতিথি অভ্যাগতের চিত্তবিনোদনের জন্য, রন্ধন বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা থাকাও চাই যে, রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দ্বারা তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে।

হরকুমার। আরে মশায়, রেখে দিন আপনার রাঁধুনিগিরি। পুত্রবধূ যদি ভাল যৌতুক লইয়া গৃহে আসে, তখন সেই যৌতুক হইতে কত রাঁধুনি রাখা যায়।

রামচরণ। রায় মহাশয়, এ কথাটা আপনি জ্ঞানীর ন্যায় বলিলেন না। যেরূপ বীজ পুঁতিবেন, সেইরূপ ফল ফলিবে। প্রাচ্যে রন্ধনের আদর সব সময়েই ছিল, বিশেষ হিন্দুরমণীর নিকট। হিন্দু দেবদেবীর নিকটও রন্ধনের আদর ছিল, দেবীরাও রন্ধন বিষয়ে নিপুণা হইলে ধন্যা মনে করিতেন। পূর্ব্বে প্রতীচ্যেও তাহাই ছিল। রন্ধন এতদিন ব্যক্তিগত ছিল; অর্থাৎ লোকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সমাজ নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, লোকে বুঝিত, রমণীগণ রন্ধনকার্য্যে নিপুণা হইলে, প্রত্যেক গৃহস্থের ও সমাজের মঙ্গল। কিন্তু ক্রমে লোকের এরূপ আত্মবিস্মৃতি হইতেছে যে, সমাজ আর সাধারণের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিতেছে না। তাই আইন লিপিবদ্ধ করিয়া সমাজ জনসাধারণকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে।

বাচস্পতি মহাশয়। রন্ধন বিষয়ে আবার আইন কি, মিত্রজা?

মিত্রজা। শুনেন নি বাচস্পতি মহাশয়, প্রতীচ্যের নরওয়ে রাজ্যে নূতন আইন জারি হইয়াছে যে, যত দিন না রমণীরা রন্ধন-বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা-পত্র (সার্টিফিকেট) পাইবে, তত দিন

তাহাদের বিবাহ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, অর্থাৎ রন্ধনকার্য্যে পারদর্শিনী না হইলে তাহার বিবাহ হইবে না।

হরকুমার। তারা ত বেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে এখন ত সংস্কারক আইন সভা হইয়াছে, তাঁহারা এই আইন জারি করুন না কেন? আপনার যেমন ধারণা,—আপনি আমাদের গৃহিণীগুলিকে রাঁধুনি করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

বাচস্পতি মহাশয়। আমাদের দেশে এই আইনের প্রয়োজন একে-বারেই নাই, সমাজবন্ধনই আমাদের সমাজ পরিচালনের মূলকেন্দ্র। সকল পিতাই যদি নিজ নিজ কন্যাকে রন্ধনকার্য্যে নিপুণা করেন, আর যদি রন্ধনকার্য্যে সুনিপুণা না হইলে অপরের কন্যাকে লক্ষ্মীরূপে নিজ গৃহে না আনেন, তাহা হইলে সব মা লক্ষ্মী ও আলক্ষ্মীরাই গৃহকার্য্যে আর রন্ধন-কার্য্যে বিশেষ গুণবতী ও অনুরতা হইবেন, নিজেরাও ধন্যা হইবেন আর সংসারের সকলকেই ধন্য ও সুখী করিবেন।

হরকুমার। তা বটে, তবে এইরূপ গুণবতী কন্যার সহিত যদি ভাল যৌতুক আসে, তাহা কি আরো ভাল নয়? সোণায় সোহাগা!

মিত্রজা। ঠিক কথা, তবে লোকে পায় কোথা?

হরকুমার। তবে লোকে মেয়ের বাপ হয় কেন?

মিত্রজা। মেয়ের বাপের বড় অপরাধ। মেয়ের বাপ আছে বলিয়া তবে ছেলের বাপের বংশরক্ষা হয়; ছেলের বাপ জীবন্তে খাইয়া পরিয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, আর মৃত্যুর পর পিণ্ড পান।

হরকুমার। অনেক সময় অপরের কন্যা-রত্ন আমাদের গৃহে আসিয়া কন্যা-কণ্টক হইয়া দাঁড়ান।

মিত্রজা। সে দোষ কাহার? সে দোষ তোমার নিজের। যিনি তোমার ভবিষ্যৎ গৃহ-লক্ষ্মী হইবেন, যাঁহার উপর তোমার সংসারের ভবিষ্যৎ সুখ নির্ভর করিতেছে, তুমি তাঁহাকে গৃহ-প্রবেশ অধিকার দিবার সময় তাঁহার বাপমাকে চোখের জলে নাকের জলে করিয়াছ। তোমার গৃহে প্রবেশাধিকার কিনিবার জন্য তাঁহার বাপমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। কাজেই যখন সেই কন্যা-রত্ন তোমার গৃহে আসিয়া তাঁহার অধিকার বিস্তার করিয়া লন, তখন তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন, যে তাঁহাকে এই অধিকারের অধিকারিণী করিবার জন্য তাঁহার বাপমা পথের ভিখারী হইয়াছেন। তখন সেই কন্যা-রত্ন সেই সমস্ত কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া তোমার পক্ষে কণ্টক হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার তখন সদাই মনে হয়, তাঁহার পিতাকে তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া সেই অধিকার কিনিয়া দিতে হইয়াছে। তখন তিনি স্বামীর উপর, তাঁহার বাপের কেনা জিনিষের উপর স্বামিত্ব-স্থাপন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর অধিকার উচ্ছেদ করেন। যখন তোমার উপর পাক পড়ে, তখন তুমি পুত্রবধূর দোষ দাও। কিন্তু তখন তুমি ভুলিয়া যাও যে তুমি তোমার পুত্রবধূকে পুত্রের সহধর্ম্মিণীর ন্যায় গৃহে আন নাই, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর ন্যায় গৃহে আন নাই, তাঁহাকে গৃহ-লক্ষ্মী রূপে আন নাই। তোমার সংসারের ভবিষ্যৎ গৃহিণী, তাঁহাকে তুমি অভ্যর্থনা করিয়া একেবারেই গৃহে আন নাই। তোমার পুত্রটি তাহার পিতাকে নিলামের সর্ব্বোচ্চ ডাকে বেচিয়াছে। বেচা-গরুর উপর তোমার আবার দাবী কি? তুমি ভাবী পুত্রবধূর পিতাকে তোমার ছেলেটি বেচিবে, আবার ছেলেটির উপর পুত্র হিসাবে সম্পূর্ণ অধিকারটিও রাখিবে—তাহা ত একেবারেই হইতে পারে

না; তুমি জিনিষটি খাবে আবার রাখিয়া দিবে—ছুটি এক সঙ্গে হইতে পারে না।

হরকুমার। মিত্রজা মহাশয় যা বলিতেছেন, তাহাতে অনেক সারবত্তা আছে।

মিত্রজা। অনেক সারবত্তা কি হে, প্রত্যেক কথাটাই সম্পূর্ণ সত্য।

হরকুমার। এ কথাটা যদি ধ্রুব সত্য, তবে লোকে এ ভুল করে কেন?

মিত্রজা। অবৈধ ধনলিপ্সা, অগাধ টাকার লোভ, যেন-তেন প্রকারেণ অর্থসঞ্চয়। প্রথম ভুল, লোকে মনে করে টাকা হইলেই সুখ হইবে, টাকা হাতে আসিলেই সুখ-বাক্সের চাবিটি হাতে আসিবে। সেইটিই সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের সমাজে প্রবাদ—বেটী-বেচার, আর বাটী-বেচার টাকা থাকে না। এ প্রবাদটি অনেকদিন হইতে জাহির আছে। আমি সেই সঙ্গে বলি বেটা বেচা আর ইজ্জত বেচার টাকাও থাকে না। বেটা বেচিয়া যে বেটীটি গৃহে আন, যত তুমি তাহার পিতাকে তোমার ছেলের দামের জন্য অধিক পেষণ কর, তত তুমি তাহার বেটীকে তোমার কাছ হইতে তফাৎ কর। যেন মনে থাকে, যেমন কার্য্য করিবে তেমনি ফল পাইবে। যেন মনে থাকে, তোমার পুত্রবধূ মানবী, সে চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘর, দ্বার ইত্যাদির ন্যায় প্রাণহীনা নয়। তাহার প্রাণ আছে, তোমার এই প্রাণহীন ব্যবহারে তাহার প্রাণে ব্যথা লাগিবে, সে চিরজীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। তোমাকে ব্যবসাদারী হিসাবে কেনাবেচার চক্ষে দেখিবে। তুমি তখন চট কেন?

হরকুমার। তা পয়সা যাহা লয় তাহা নিজের জন্য নয়। বৈবাহিক দেয় তাহার কন্যা ও জামাতার জন্য।

মিত্রজা। মিথ্যা কথা! ছেলের দাম বলিয়া লয়, আত্মাভিমানের দাম বলিয়া লয়। হরিঘোষ ছেলের বিয়েতে দশ হাজার টাকা নগদ পাইল, রামমিত্র বিশ হাজার পাইল, আর আমি হরকুমার রায়, আমি রামমিত্রের চেয়ে কিসে ছোট, যে, আমার ছেলের বিয়েতে আমি ত্রিশ হাজার টাকা পাইব না? এই ত্রিশ হাজার টাকা তোমার আত্মশ্লাঘার দাম, তোমার বাজারে বেচাকেনা ইজ্জতের দাম। আর তুমি মুখে বল, তুমি বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তুমি মিথ্যাবাদী! তুমি নিজের অহমিকা লইয়া মাতোয়ারা হইয়া আছ, আর মুখে নিঃস্বার্থের ভান কর। আর যখন ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে তোমার স্বকৃত পাপের জন্য সাজা পাও, তখন ধার্ম্মিকের ভান করিয়া সমাজের দোষ দাও, কলিকালের দোষ দাও, তোমার দুঃখের মূলভিত্তি কলিকালের মাহাত্ম্য বলিয়া নির্দ্দেশ কর। নিজের কর্ম্মফলে কষ্ট পাইলে, তাহা আত্ম-অভিমানে কখনও স্বীকার কর না।

হরকুমার। আমি না হয় ছেলের বিয়েতে ত্যাগ স্বীকার করিলাম, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে আমার হবু বৈবাহিক যদি ত্যাগ স্বীকার না করেন?

মিত্রজা। না করেন ব'য়ে গেল। চোরে চুরি করে, তুমি সাধু; তবে চোরে তোমার দ্রব্য অপহরণ করে, তাই বলিয়া তুমি সৎ থাকিবে না? পৃথিবীতে ভাল মন্দ দুই আছে। তুমি ভাল হও, অপরকে ভাল পথ দেখাও, অনেক মন্দকে ভাল করিতে পারিবে। তুমি ভাল হইলেও অনেকে মন্দ থাকিবে, সে কারণে তুমি ভাল হইবে না—ইহা অতি অসঙ্গত কথা, অতি অন্যায় যুক্তি।

বাচস্পতি। রায় মহাশয়, মিত্রজা যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অর্থে সব সময়ে সুখ মিলে না, পুত্র কন্যার বিবাহে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন না। পুত্রের বিবাহে গুণবতী পুত্রবধূ গৃহে আনুন, পৃথিবীতে সুখ পাইবেন, সংসারে সুখী হইবেন। গৃহে লক্ষ্মী আনয়ন করুন; গৃহে লক্ষ্মী আসিলে ধন জন সব আপনাআপনি আসিবে। সে লক্ষ্মীর বরযাত্রী, লক্ষ্মী আসিলে টাকা কড়ি জিনিষপত্র আপনিই আসিবে। সেগুলি সর্ব্ব সময়ে লক্ষ্মীর দ্বারা আকৃষ্ট। তাহাদের জন্য আপনাকে চেষ্টা করিতে হইবে না, আপনা হইতেই সেগুলি আসিবে।

৯

"বড় হবি ত ছোট হ"

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর রাঘববলপুরের রামহরি ঘোষের পুত্র সুপ্রকাশের সহিত অনুপমার বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

মহা ধূমধামেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। বরের তরফ হইতে ২৯৯ খান পত্তের কাগজ ছাপা হইয়াছিল। আর কন্যার তরফ হইতে ২৬৬ খান কাগজ ছাপা হয়।

আজকাল পাত্র পাত্রী না হইলেও বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু বর কন্যার তরফ হইতে বিবাহ উপলক্ষে স্তূপাকার ভালমন্দ, চলনসই, ছাইভস্ম, মাটী পত্তের কাগজ ছাপা না হইলে বিবাহের সম্ভাবনা নাই। বরকনের যে সব গুণ কস্মিনকালেও ছিল না, বা তাহাদের মধ্যে কোনকালে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সেই গুণাবলী ও রূপবর্ণনা সেই সমস্ত পত্তের কাগজে লিপিবদ্ধ হয়। পাত্র মূর্খ হইতে পারে, পাত্র নির্গুণ হইতে পারে, পাত্রের পিতা অর্থহীন হইতে পারেন, তিনি পাঁচজন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের জন্য পাত পাতাইবার আয়োজনে অসমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের বিবাহে ছাপাখানাওয়ালাদের যৎ-কিঞ্চিৎ পাওয়া চাই। আর সেই যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার নিজ অর্থ হইতেই হউক বা তাঁহার পূর্ব্বের লুক্কায়িত সঞ্চিত অর্থ হইতেই হউক; আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের অর্থ হইতেই হউক বা কন্যার পিতার অর্থেই হউক।

কন্যার তরফ হইতেও তদ্রূপ, কোন অবস্থাতেই সে অর্থ বরের

পিতার নিকট হইতে আসে না। যদিও পদ্য ও গদ্য রচনাগুলি বরের ও কনের মাতাপিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধুবান্ধবদের নামে ছাপা হয়, রচনাগুলি একজন বা দুইজনের। এই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তনে ছোট ছোট ছাপাখানাওয়ালাদের দু'পয়সা বেশ আসে, আর কাগজও বেশ কাটতি হয়।

বিবাহের পর অনুপমা রাঘববলপুরে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিল। সে বুদ্ধিমতী, গুণবতী, শান্তশিষ্টস্বভাবসম্পন্না, কার্য্যক্ষমা, সংসার-কর্ম্মে বিশেষ নিপুণা। বাল্যকাল হইতে তাহার দেবদ্বিজে ও গুরুজনে ভক্তি ও আত্মীয়স্বজনে ভালবাসা। অভ্যাগত আগন্তুকের সেবা, অতিথি-সৎকার এবং নর-নারায়ণের পরিচর্য্যায় সে সিদ্ধহস্তা। বালিকা অবস্থা হইতেই সে বারব্রত করিয়া পূজাপার্ব্বণে যোগ দিয়া আত্মসংযম করিতে শিখিয়াছে, নিজেকে কষ্ট দিয়া পরকে সেবা করিতে শিখিয়াছে। কাজেই যখন শ্বশুর-বাটী আসিল, তখন সে বাটীর সকলকে আপন করিয়া লইতে তাহার কোন কষ্টই হইল না।

বাচস্পতি মহাশয়ের টোল ও বাটী, রামচরণ মিত্রের বাটীর অতি সন্নিকটে। মিত্রজা মহাশয় কায়স্থ, আর বাচস্পতি মহাশয় ব্রাহ্মণ হইলেও, দুই ভদ্র পরিবারের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। শোকে দুঃখে, সুখে সম্পদে, কাজকর্ম্মে, পাল-পার্ব্বণে দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ও আত্মীয় ব্যবহার ছিল।

অনুপমা মেনকা অপেক্ষা বয়সে কয়েক বৎসরের ছোট, কিন্তু সে মেনকারাণীর বিশেষ অনুগতা। অনুপমা মেনকারাণীকে ভক্তি করে, ভালবাসে ও তাহার অনুকরণ করে। মেনকার প্রতি তাহার বিশেষ

প্রীতি। মেনকার আচার ব্যবহার, চালচলন, কার্য্যকলাপ তাহার বেশ ভাল লাগে, আর যতদূর সম্ভব তাহাকে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। দুইটির মধ্যে একই মাতার গর্ভজাত দুইটি কন্যার ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম আছে।

বিবাহের পর যখন অনুপমা প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করিল, তখন মেনকারাণী সহোদরা জ্যেষ্ঠাভগ্নীর ন্যায় তাহাকে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। এতদিন অনুপমা মাতাপিতার ক্রোড়ে, আত্মীয় স্বজনের আদরে, ভাইভগ্নীর সঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছে। একদিনের জন্য একটি রূঢ় কথা শোনে নাই, নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা আদর ও যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন সে তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকটে যাইতেছে; সে তাহাদের প্রিয় পুত্রের সহধর্ম্মিণী হইয়া শ্বশুরালয়ে যাইতেছে। তাহাদের অতি যত্নের পাত্রী,—ভাল করিয়া ব্যবহার করতে জানিলে, অতি আদরের পাত্রীই থাকিয়া যাইবে; আর ব্যবহারের ভুল হইলে তাহাদের ভালবাসার সম্পূর্ণ অধিকার হইতে চ্যুত হইবে। অতএব তাহাকে অতি সন্তর্পণে চলিতে হইবে, একটু ভুল করিলে তাহাদের ভালবাসা হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িবে। তাহার স্বামীকে শ্বশুর শ্বাশুড়ী ভালবাসে, কেন না তিনি তাহাদেরই পুত্র, তাঁহাকে এ জগতে আনিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারা তাহার সুখশান্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। পুত্রবধূ পুত্রের সুখশান্তির কেন্দ্রস্বরূপ, সেই কারণে শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে ভালবাসিবে ও যত্ন করিবে। তাঁহাদের এই ভালবাসা ও যত্ন তাহার নিজের জন্য নয়, অপরের কারণে। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ তাহার নিজের ব্যবহারের উপর নির্ভর

করিতেছে। সে যদি তাঁহাদের ভালবাসা ও যত্ন নিজের গুণে অর্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহার সুখ শান্তি নিশ্চিত। এইজন্য তাহাকে তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী, স্বামীর আত্মীয় স্বজনের প্রতি ও শ্বশুরালয়ের লোকজনের প্রতি এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যে, তাহার ব্যবহারের দ্বারা তাঁহারা সকলে তাহার প্রতি যেন আকৃষ্ট হয়েন। আর স্বামী ও তাহার জীবনের উপাস্য দেবতা। বালিকা অবস্থা হইতে হিন্দু ললনা শিখিয়াছে পতিকে সেবা করিতে, পতিকে ভক্তি করিতে, পতিকে পূজা করিতে। ব্রতে, পূজায়, কথায় বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছে—"পতি পরমগুরু।" সেই পতি, যাহার কথা এতদিন সে শুনিয়াছিল, আর ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল, এখন বিবাহের পর সেই পতি তাহার সম্মুখে সশরীরে আসীন, তাহাকে ভালবাসিতে হইবে, ভক্তি করিতে হইবে, তাহাকে নিজের করিয়া লইতে হইবে। তবে চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইবে। তবে চেষ্টা করা চাই, বিনা চেষ্টায় কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নয়।

শেষে অনেক উপদেশ দিবার পর বলিয়া দিলেন,—যাও বোন, এতদিন ভালবাসা ও যত্ন, গোমুখীর জলপ্রপাতের ন্যায় আপনা আপনি তোমার উপর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছিল, তুমি প্রপাতের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলে, জল তোমার উপর আসিয়া পড়িতেছিল ; এখন শ্বশুরালয়ে যাইতেছ, সেখানে গিয়া সরোবরের বা কূপের জলের ন্যায় তোমাকে ভালবাসা ও যত্ন বিশেষ কষ্টে যোগাড় করিয়া লইতে হইবে। জল আছে, তবে তোমাকে উঠাইয়া লইতে হইবে। আর চেষ্টা কর সুখ পাইবে, না কর কষ্ট পাইবে ; সুখ দুঃখ তোমার নিজের হাত।

অনুপমা শ্বশুরালয়ে গিয়া সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিল। সকলের প্রাণই তাহার সুন্দর ব্যবহারে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ননদিনী রাজকুমারী প্রথম হইতেই তাহার প্রতি রূঢ়ভাবাপন্না, কারণ তাহার কোমল ব্যবহার। সকলেই অনুপমার ব্যবহারে আপ্যায়িত, তাহার প্রতি আকৃষ্ট, সকলেই তাহার প্রশংসাবাদে ব্যস্ত। রাজকুমারীর তাহা ভাল লাগিত না, তাই সে অনুপমার প্রতি রাগান্বিতা।

অনুপমা তাহার এই ব্যবহারে কিছুমাত্র বিচলিতা বা ভীতা হইল না। যখন সে পাকে প্রকারে তাহার ক্রোধভাব বুঝিতে পারিল, তখন সে তাহার এই অন্যায় ব্যবহারের পাল্‌টা জবাব অন্যায় ব্যবহারে না দিয়া আরও মিঠা ব্যবহার করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম রাজকুমারী তাহার সদ্ব্যবহারের প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল, আরও রুষ্টভাব ধারণ করিল; কিন্তু যখন দেখিল তাহাতেও অনুপমার ব্যবহারের মন্দ দিকে কোন পরিবর্তন হইল না, তখন সে আপনিই নিজের রুক্ষ ব্যবহারের পরিবর্তে কোমল ব্যবহার আরম্ভ করিল। ফলে উভয়ের মন প্রাণ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে বুঝিল তাহাদের এই যুদ্ধে অনুপমা জয়ী, আর সে নিজে পরাজিতা।

অনুপমার ব্যবহার নিরবচ্ছিন্ন শান্ত, শিষ্ট ও কোমল। অনুপমা তাহার ব্যবহারের দ্বারা মানিয়া লইল, সে ছোট আর রাজকুমারী বড়, সে সামান্যা আর রাজকুমারী মহতী। কাজেই রাজকুমারীর আর কোন বিবাদের কারণ রহিল না, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের ও আধিপত্যের বিষয়ে কোন প্রশ্ন রহিল না। অনুপমা তাহা স্বীকার করিয়া লইল, কাজেই সকল গোল মিটিয়া গেল। দুজনের মধ্যে বিবাদের পরিবর্তে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল, মনোবিবাদের কারণ সমূলে অপসারিত হইল।

১০

"স্বার্থত্যাগে, আত্মোৎসর্গে—আত্মজয়, জগৎজয়"

পিত্রালয়ে রাজকুমারীর প্রাধান্য বজায় থাকিলেও শ্বশুরালয়ে তাহার প্রাধান্য আজ পর্যান্তও স্থাপিত হইল না। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখনও স্বামীর সহিত তাহার পৃথক্ পৃথক্ ভাব। প্রকাশ্যে কোন কলহই নাই সত্য, কিন্তু দুজনেই পরস্পরের কাছ হইতে তফাৎ থাকিতে উৎসুক। ক্রমে এই ব্যবহারে যে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, আত্মীয়স্বজন, লোকজন সকলেই একটু বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ, তাহা রাজকুমারী বেশ অনুভব করিল। বুঝিতে পারিল, বীণাটি কোন এক স্থানে বেসুরো বাজিতেছে, কোথায় একটু গোলযোগ হইয়াছে। কিন্তু কেন এরূপ হইল? আবার পরক্ষণে ভাবে ইহার জন্য দায়ী কে? সে নিজে কখনই নয়; সে কিছুই অন্যায় করে নাই, অতএব সে কি করিবে? সে চেষ্টা করিবে তারটি ঠিক করিয়া বসাইতে? তথাপি যদি বীণার সুর ঠিক না হয় ত, সে কি করিতে পারে? কার্য্যতঃ কিন্তু সে কিছুই করিল না। বীণার সুরও ঠিক হইল না।

কাজেই শ্বশুরালয়ে অতি অল্পকাল থাকিয়াই রাজকুমারী নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল। রাজকুমারী রাঘববলপুরে আসিল বটে, কিন্তু মুক্তেশপ্রকাশ এক দিনও সেখানে আসিলেন না। রাজকুমারীর অহঙ্কার তাহার ভ্রান্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে; কোথায় গল্তি আছে তাহা সে বুঝিতে

পারিতেছে না, গলদ যে তাহার অহমিকাজনিত তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। আর কিরূপ চেষ্টা করিলে বা তাহা বিদূরিত করা যায়, তাহাও সে স্থির করিতে পারে নাই।

এবার প্রায় ছয় মাস হইল, রাজকুমারী রাঘববলপুরে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে মুক্তেশপ্রকাশ একদিনও শ্বশুরালয়ে আসিলেন না। রাজকুমারী অহঙ্কারিণী হইলেও এখন আর সে প্রফুল্লিতা নয়। তাহার অহমিকার মাত্রা এত বেশী নয় যে, সে নিজে হাস্যময়ী হইয়া মনের আবেগ চাপিয়া অপরের নিকটে প্রাণের আবেগ গোপন করিতে পারে। তাই সে অহমিকা-সত্ত্বেও দমিয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বদাই মনমরা।

অনুপমা বুদ্ধিমতী ও মেধাবিনী, সে রাজকুমারীর মনোব্যথা বুঝিতে পারিল। তবে ইহার প্রকৃত কারণ কি বুঝিতে পারে নাই। একদিন সে রাজকুমারীকে একলা পাইয়া বলিল—"দেখ দিদি, তুমি সর্ব্বদাই কেমন যেন মনমরা হইয়া থাক। এ রকম হচ্ছ কেন, বল দেখি ; আর ঠাকুরজামাই বা কি রকম, তোমাকে ছাড়িয়া এতদিন রহিয়াছেন। তিনি গত কয় মাসের মধ্যে তোমাকে একবারও দেখিতে আসিলেন না।"

রাজকুমারী। না বোন, ও কিছু নয়। আর কি জান, তোমার ঠাকুরজামাই সর্ব্বদা কাজ লইয়া ব্যস্ত। তিনি আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না। পাছে তাঁহাদের সেবার ব্যাঘাত ঘটে।

অনুপমা। সে কথা সত্য বটে, তবে কি জান, সব কাজের জন্যই ত সময় করিতে হয়। তোমার খোঁজ খবর লওয়াও ত তাঁহার একটা কাজ।

রাজকুমারী। কোন্‌টা নিজের কর্ত্তব্য, কোন্‌টা নয়, তাহাও বুঝা ত

সব সময়ে তত সোজা নয়। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কার্য্য করা নিজের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে।

অনুপমা। আমাদের ঠাকুরজামাইও ত উচ্চ শিক্ষিত।

রাজকুমারী। তবে বুনিয়াদি ঘরোয়ানা হিসাবে আমার দাদার যা সুবিধা আছে, তোমার ঠাকুরজামায়ের তাহা নাই।

অনুপমা। তাহাতে কি এসে গেল? মানুষ ভগবানের কৃপায় শিক্ষাতে আপনাকে দেবতাও করিতে পারে, আর দানবও করিতে পারে। আর প্রত্যেক রমণীর কর্ত্তব্য আপন স্বামীকে কর্ত্তব্য-পথে আনা, সে যদি তা না পারে তবে তাহা নিজের দোষ। সে রমণী নামের অযোগ্য।

রাজকুমারী। ঘোটককে সরোবরের কাছে আনিয়া দিতে পার, কিন্তু জল খাওয়াইতে পার কি?

অনুপমা। আমি বিশ্বাস করি, তখনই না খাইতে পারে, জলের ধারে আনিয়া রাখ, খানিক পরে আপনিই খাইবে।

রাজকুমারী। আমি কি ক'রতে পারি, সে যদি আমার খবর না লয়; আমি কি তাহাকে সাধিতে যাইব?

অনুপমা। দিদিমণি, আমি তোমার কথায় আশ্চর্য্যান্বিতা ও মর্ম্মাহতা হইলাম। তিনি হইলেন আপনার স্বামী, প্রভু, তাঁহাকে সাধিলে যদি সব গোল মিটিয়া যায় তবে অবশ্যই আপনাকে সে কার্য্য করিতে হইবে।

রাজকুমারী। তবে বংশমর্য্যাদাটা কি কিছুই নয়?

অনুপমা। নিশ্চয়, সেটা এরূপস্থলে ছাই আর পাঁশ। যাঁহার হস্তে আমার জন্মদাতা পিতা, আমাকে দাসী বলিয়া সম্প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাকে আমি স্বামী বা প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য

আমার অহমিকাকে বলিদান দিতে হইবে। সে বিষয়ে কি আর কোন কথা আছে? আমি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী; স্বামী একার্দ্ধ, আমি অপরার্দ্ধ। স্বামী সম্পূর্ণ হইতে গেলে, আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বরকমে সহকারিতার প্রয়োজন। দুইজনে এক হইতে গেলে আমার স্বভাবের ও মনের খোঁচগুলি আর তাঁহার স্বভাবের ও মনের খোঁচগুলি পাশাপাশি রাখিয়া ও ঘষিয়া মাজিয়া মসৃণ করিতে হইবে, আমার খোঁচগুলি নির্ম্মূল করিতে হইবে, আর তাঁহার খোঁচগুলি ঘষিয়া মসৃণ করিয়া লইতে হইবে, তবে ত দুইটি পাশাপাশি রাখিলে এক হইয়া যাইবে। যতদিন আমাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকিবে, ততদিন দুইটিতে মিলিয়া এক হইতে পারে না। আমাকে তাঁহার খুব নিকটে থাকিতে হইবে, তবে উভয়ের মিলন সম্ভব, নতুবা নয়। আমরা দুইজনে এক মত এক প্রাণ হইলে তবেই উভয়ের মিলন হইবে, তবেই আমি তাঁহার প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গিনীবাচ্য হইতে পারিব; আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহার সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিব, তবে ত উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতে পারিব। আমাতে যাহা কিছু খোঁচখাঁচ আছে, আমাতে যাহা কিছু বেয়াড়া আছে, যাহা কিছু বিশ্রী আছে, যাহা কিছু সকোণ আছে, আমাতে যাহা কিছু মাধুর্য্যহীন আছে, আমাতে যাহা কিছু লালিত্যশূন্য আছে, আমার স্বভাবে যে উগ্রতা আছে, সেগুলিকে দূর করিতে হইবে, সেগুলিকে সরল করিতে হইবে, সে কোনাচেগুলিকে মসৃণ করিয়া ফেলিতে হইবে, তবে আমি তাঁহার সহিত মিলিতে পারিব এবং মিলিত হইয়া তবে উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিব। প্রথমে সম্পূর্ণ মিলন চাই, তবে একত্র ধর্ম্মার্জ্জন সম্ভব।

রাজকুমারী। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে স্বামীকেও ত তাঁহার

স্বভাবের উগ্রতা নষ্ট করিতে হইবে, তাঁহাকেও ত তাঁহার স্বভাবের খোঁচখাঁচ ঘষিয়া মাজিয়া মসৃণ করিয়া লইতে হইবে।

অনুপমা। নিশ্চয়ই। তবে তুমি তাঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, তুমি কেন প্রথমে ত্যাগ-স্বীকার করিবে না? তুমি প্রথমে তাঁহার কাছে গিয়া কেন বলিবে না--স্বামিন্, আমার আমিত্বটুকু তোমার পদ-প্রান্তে বলি দিয়াছি, আমার নিজস্ব কিছুই নাই, আমি নিজেই তোমার, অতএব তোমার যাহা কিছু আছে, আমি তাহার সমান অংশে অধিকারিণী, তোমার পুণ্যের অংশীদার, তোমার পাপের অর্দ্ধেকেরও দায়ী। আমি যেমন আছি আমাকে গ্রহণ কর। আমাকে বিবাহ করিয়াছ, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া গ্রহণ করিয়াছ, আমি যেমনটি ছিলাম সে অবস্থাতেই লইয়াছ; আমার খুঁত থাকে আমাকে শোধরাইয়া লও, এটি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য, তুমি না কর ধর্ম্মে পতিত হইবে। সুখ স্বার্থত্যাগে, সুখ আত্মোৎসর্গে, সুখ আত্মবলিদানে। আমিত্বে নহে।

রাজকুমারী। আমি আমার আমিত্ব নষ্ট করিব, আমি আত্মত্যাগ করিব, আমি আত্মোৎসর্গ করিব, আর তিনি যদি আমাকে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর ন্যায় ব্যবহার না করেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্বীকার না করেন?

অনুপমা। বড়দিদিটি আমার, তুমি বড়ই ভুল বুঝিতেছ। তোমার আত্মোৎসর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই, তোমার নিজের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস চাই। তুমি একটু ত্যাগ স্বীকার করিবে, আর ওজন করিয়া দেখিবে তোমার ত্যাগ-স্বীকারের বদলে তিনি কি ত্যাগস্বীকার করিলেন, তাহা হইলে চলিবে না। তুমি তোমার ত্যাগস্বীকারের বদলে কিছু পাইলে কি না, সে বিষয়

ভাবিবে না। তাহা হইলে ত্যাগ হইল না; আদান-প্রদান হইল, কেনা-বেচা হইল। তুমি কেনা বেচা হিসাবে কার্য্য করিবে না। আত্মত্যাগ করিবে, স্বার্থত্যাগ করিবে, আত্মোৎসর্গ করিবে, সম্পূর্ণরূপে অহমিকার বলিদান দিবে। তোমার লাভ---স্বার্থত্যাগের সুখ, আত্মোৎসর্গের আনন্দ; পরের সুখকল্পে নিজের বলিদান, তাহাতে আরাম আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে। সেই আত্মোৎসর্গে স্বামীকে জয় করিতে পার ভালই, তা না হয় আত্মজয় ত হইল; যেদিক থেকেই দেখ, জয় তোমারই।

রাজকুমারী। (একটু ভাবিয়া) ছোট বোনটি আমার, আমি তোমার কথাই শুনিব। তোমার উপদেশই পালন করিব, স্বার্থত্যাগ করিব, আমার অহমিকা বলি দিব। আত্মত্যাগে ও স্বার্থত্যাগে নিজেকে জয় করিব। স্বামী জয় করিতে পারি ভালই, না পারি আত্মজয় ত হইবে। বোন, এ অতি সুন্দর কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এত দিন এই কথাটুকু বুঝিতে পারি নাই। আজ তুমি আমার চোখ ফুটাইয়া দিলে। আজ হইতে তোমারই উপদেশ মত কাজ করিব।

এমন সময়ে কে যেন ডাকিল "বৌমা"---অমনি অনুপমা "যাই মা"—বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। রাজকুমারী একেলা বসিয়া অনুর কথাগুলি মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

১১

কি ছিল—কি হল !

পাঁচটা বাজিয়া গেল—তবুও বৌমা এলো না—ক্রমে রায়গৃহিণী উতলা হইয়া উঠিলেন—তখন শ্যামা দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ্ ত শ্যামা এখনও বৌমা এল না কেন ? কখন তাকে আন্‌তে গেছে, এখন এল না, রাস্তা-ঘাট ভাল নয়—যা, শীঘ্র একবার দরওয়ানকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত।"

শ্যামা, যাই বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল বটে, কিন্তু দরওয়ানের ঘরে না গিয়া আপন ঘরেই প্রবেশ করিল। আর নিজ গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"মা, কি বউই করেছেন— গ্যাদারে ভুঁয়ে পা পড়ে না—আর দাস দাসীর উপর যত আস্ফালন—একটু ত্রুটি হবার যো নাই, পান থেকে চুণ খসবার যো নাই— এমন বৌ যে কয় দিন না আসে সেই কয় দিনই আমাদের শান্তি। মা ঠাকুরাণী যেমন মাটির মানুষ, বৌ হয়েছে তেমনি তার উল্টা, রূপে পরীর মত দেখ্‌লে কি হয়, গুণে যে—

এমন সময় রাজকুমারী পাল্কী হইতে নামিল—নামিয়া চারিদিকে দেখিল—কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না—আগেকার মত হলে এই সময়েই অনর্থ করিয়া বসিত, কিন্তু আজ সে 'অনুর' আদেশ মত সে সব আদৌ লক্ষ্যই করিল না—বরং ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

শ্যামাদাসীর ঘরের কাছে আসিয়া বুঝিল, শ্যামা নিজ গৃহ পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। তখন শ্যামাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ লা, শ্যামা, ঘরের ভিতর কি কচ্ছিস্—আমি এলাম একবার খবরও নিলি না?"

শ্যামা ভয়ে ও লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। রাজকুমারী তাহাকে দেখিয়া বলিল—"ও-মা শ্যামা, তুই এত রোগা কেন্‌লা—অসুখ বিসুখ হয়েছিল বুঝি?"

শ্যামা ভাবিয়াছিল—বৌ বুঝি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার বদলে তাঁহার মুখ হইতে এরূপ মিষ্ট কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। আর বলিল—"হাঁ বৌ-দিদি, আমার বড় অসুখ করেছিল।"

রাজকুমারী। এখন ভাল হয়েছিস্ ত—আর জ্বর টর নাই ত?

শ্যামা। হাঁ, বৌ-দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে এখন ভাল হয়েছি, ভাতও খেয়েছি।

রাজকুমারী। আহা—শ্যামা, তুই কি ছিলি, আর কি হয়েছিস্—তোকে দেখে চেনা যায় না, তুই বুঝি সে শ্যামা নস্।

শ্যামা রাজকুমারী কথা শুনিয়া মনে মনে বলিল—"আর বৌ-দিদি তুমি কি ছিলে—আর কি হয়েছ—আমায় দেখে চেনা যায় না, আর তোমায় দেখে বোঝা যায় না! বোধ হয় যেন তুমি সে বৌ নও। যাহা হউক, প্রকাশ্যে বলিল—"চল বৌ-দিদি, উপরে চল"—এই বলিয়া শ্যামা তাহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল।

রাজকুমারী তাহাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া বলিল—"থাক, শ্যামা, তোকে আর কষ্ট করে আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে না, এখন বল দেখি মা কোথায়?"

শ্যামা। মা আর কোথায়—সেই ঠাকুর ঘরেই। তাঁর ঠাকুর ঘর, আর ঠাকুর ঘর। জানই ত বৌদিদি, ঠাকুর ছেড়ে তিনি এক দণ্ড থাকতে পারেন না।

রাজকুমারী সে কথায় কান না দিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন,—একেলাই চলিলেন শ্যামাকে সঙ্গে আসিতে দিলেন না। তার অসুখ শরীর—সঙ্গে আসিতে কষ্ট হবে।

শ্যামা কিন্তু থাকিতে পারিল না—পিছু পিছু চলিল, দূর হইতে গিন্নিমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—"ঐ দেখ, বৌমা, মাঠাকরুণ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিবার জন্য সল্‌তে পাকাচ্ছেন।"

রাজকুমারী দ্রুতপদে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিল। আর জিজ্ঞাসা করিল—"মা, কেমন আছেন?"

হৈমবতী রাজকুমারীর এই ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্টা হইলেন—বুঝিলেন তাঁহার বৌ-মার বুদ্ধি হইয়াছে। এরূপ ভক্তিভাবে প্রণাম রাজকুমারীর জীবনে এই প্রথম—তাহার উপর মা কেমন আছেন, এরূপ বাক্যও শ্বাশুড়ীর কর্ণকুহরে এই প্রথম প্রবেশ করিল। তাই মনে মনে বলিলেন—"এতদিনে ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন—"আর প্রকাশ্যে বলিলেন—"এই যে বৌমা—এস মা, এস মা, তোমার দেরী দেখে ভাবছিনু—যা হ'ক এলে বাঁচলাম, কেমন আছ মা? তোমাদের বাটীর সকলে ভাল আছেন ত? এত দেরি হল কেন মা?—যে পথ ঘাট, ভেবেই অস্থির।" রাজকুমারী একে একে শ্বাশুড়ীর সমস্ত কথার উত্তর দিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঠাকুরঘরের দ্বারদেশে গিয়া গললগ্নবস্ত্রা হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "ঠাকুর, আমায় রক্ষা কর, আমার মনে বল দাও, হৃদয়ে ভালবাসা দাও, মুখে মিষ্ট কথা দাও—আমি যেন সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারি আর যার জন্য এই নারীজন্ম, তাঁহার ভালবাসা যেন অর্জ্জন করিতে পারি" এই বলিয়া বার বার তিনবার ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করাইল।

হৈমবতী ঠাকুরের প্রতি পুত্রবধূর এরূপ ভক্তি দেখিয়া বুঝিলেন, বৌমার এতদিনে ভক্তি হয়েছে কিন্তু বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৌমার এখনও বুদ্ধি হয় নাই, আগে ঠাকুর প্রণাম করিয়া তবে শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিতে হয়।"

রাজকুমারী ধীরে ধীরে বলিল—"কেন মা, এ পৃথিবীতে মাই ত সাক্ষাৎ দেবী আর পিতা সাক্ষাৎ দেবতা—অন্য দেবদেবীরা ত আমাদের সঙ্গে কথা কন না—তাঁহাদের পূজা না করিলে তাঁহারা কোন বর দেন না, আর মা বাপের নিকট কিছু চাইতে হয় না— তাঁরা নিজেই আমাদের অভাব বুঝিয়া নিজেই তাহা পূরণ করেন। এরূপ সাক্ষাৎ দেবী সম্মুখে রয়েছেন,—তাঁকে আগে প্রণাম করবো না ত কাহাকে প্রণাম করবো মা ?"

হৈমবতী পুত্রবধূর কথার কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—"আরে পাগ্‌লী মেয়ে, তোর বাপ মা, শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে ত ঐ দেব দেবীর নিকট হইতেই পেয়েছিস্। তখন দেবদেবীকেই আগে প্রণাম করতে হয়। ক্রমে বুঝবে মা। যাক আর দেরী কর না—কখন সেই রাঘববলপুর হইতে বেরিয়েছ—আর ৬টা বেজে গেল, যাও মা, আগে মুখে

হাতে জল দিয়ে এস মা”—(তাহার পর শ্যামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) যা শ্যামা, আমার মা লক্ষ্মীর মুখ হাত ধুইয়ে দিয়ে একটু জল খেতে দিগে যা—বৌমার উচিত ছিল আগে মুখ হাত ধুয়ে তবে ঠাকুর প্রণাম করতে আসা—তা না সেই রাস্তার কাপড়েই বৌমা আমার এখানে এলো—এখনও বৌমার তেমন বুদ্ধি হয় নাই।

রাজকুমারী। মা, লোকে বলে ধূলো পায়েই দেব দেবী দর্শন করতে হয়—তাই আপনাকে আগেই দর্শন করতে এলাম।

হৈমবতী বার বার তিনবার নিজ পুত্রবধূর নিকট পরাজিতা হইয়া মনে মনে বলিলেন—“আজ কালকার মেয়েদের নিকট কথায় পারবার যো নাই—” কিন্তু এরূপ পরাজয়ে সুখ আছে; সুতরাং পুত্রবধূর কথায় তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাই বলিলেন “যাও মা, আর দেরী কর না। শীঘ্র শীঘ্র মুখ হাত ধুয়ে এস মা।—হ্যাঁলা শ্যামা, এখনও তুই দাঁড়িয়ে রইলি—যা না—বৌমাকে নিয়ে যা না।”

রাজকুমারী শাশুড়ীর আদেশ মত সে স্থান পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু মুখ হাত ধুইতে না গিয়া আপন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া দেখিল যে তাহার ঘরের সে শ্রী নাই। বুঝিল, তাহার অনুপস্থিতিতে দাসদাসীগণ তাহার গৃহের এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। তখন শ্যামাকে বলিল—“দেখ্ ত শ্যামা, আমার সঙ্গে পেটরা ও বাক্স আনিলাম, সে গুলো রাখ্‌লে কোথায় জিজ্ঞেস করে আয় ত?” শ্যামা “দেখি” বলিয়া চলিয়া গেল।

এই অবসরে রাজকুমারী আপন শয়ন কক্ষটি নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া লইল। মলিন বসনগুলির পরিবর্ত্তে ধৌত বস্ত্রাদি আলমারী হইতে বাহির করিয়া বিছানা আন্‌লা প্রভৃতি সুসজ্জিত করিয়া

লইল। আর যেখানে যাহা অপরিষ্কার ছিল, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তাহার পর স্বামীর ফটোখানি নামাইয়া নিজ বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল। আর আপন গলদেশ হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া ছবিখানির চারিদিকে জড়াইয়া দিয়া জোড় হস্তে প্রণাম করিতে করিতে বলিল "স্বামিন্, আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করুন—আর দয়া করিয়া আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে আপনার মনের মত করিয়া লউন।"

ঠিক এই সময়ে শশীমুখীর ছোট ছেলেটি (সনৎকুমার) রাজকুমারীর গৃহের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বৌদিদি কি করিতেছে। যখন দেখিল যে বৌদিদি দাদাবাবুর ফটোখানিকে নমস্কার করিতেছে—তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখে যা মা—তোদের বৌ দাদাবাবুর ছবিকে প্রণাম করছে। বৌ মনে করেছে বুঝি ও খানা কোন ঠাঁকুরের ছবি। বৌদিদি কাহার ছবি চিনিতে পারেনি!" তাহার পর রাজকুমারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"এ কি বৌদিদি, দাদাবাবুর ছবি তা বুঝি চিন্‌তে পারনি তুমি কি বোকা মেয়ে গা।"

রাজকুমারীর চমক ভাঙ্গিল, সে পিছন ফিরিয়া দেখিল—সনৎকুমার, আর তাহার পিছনে, তাহার মাতা শশীমুখী।

রাজকুমারী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"এই যে পিসিমা—আপনি কেমন আছেন?" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

শশীমুখী। থাক্ মা, আর প্রণাম করতে হবে না, চিরএয়োস্ত্রী হয়ে দীর্ঘজীবি হয়ে থাক মা—মাথার সিন্দুর অক্ষয় হক।

এদিকে রাজকুমারী সনৎকুমারকে কোলে নিয়া বলিল "দেখ্ সনৎ—তোমার জন্যে আমি কেমন একটা জিনিস এনেছি"—এই বলিয়া তাহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গে যে যে জিনিস আনিয়াছিল, সে সবগুলিই সেইখানে রয়েছে। একটা ট্রাঙ্ক তখন খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী পুতুল বাহির করিয়া সনৎকুমারের হাতে দিয়া বলিল—"কেমন দাদা, পছন্দ হয়েছে ত?" আর সনৎকে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

সনৎ পুতুল পাইয়া এক গাল হাসি হাসিল—আর মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "দেখ্ মা, আমার বৌদিদি আমাকে কেমন একটা নতুন পুতুল দিয়েছে"—এই বলিতে বলিতে রাজকুমারীর কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজকুমারী কিন্তু তাহাকে সহসা নামিতে দিল না, তাহার মুখ চুম্বন করিতে করিতে তাহার মাতার নিকট লইয়া আসিল।

মাতা পুত্রের আহ্লাদে আহ্লাদিতা হইয়া বলিল, "দেখ্লি, তোর বৌদিদি তোকে কেমন ভালবাসে?"

সনৎকুমার পুতুল পাইয়া রাজকুমারীর কোল হইতে নামিয়া আহ্লাদে ছুট দিল—ইচ্ছা বাটীর সকলকে দেখাইবে, আর বলিবে তাহার বৌদিদি কেমন লক্ষ্মী। শিশুদের কি সরল প্রাণ, অল্পে সন্তুষ্ট, আর দাতার গুণ গান তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। তখন শশীমুখীও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

তাহারা চলিয়া যাইতে না যাইতে শ্যামা আসিয়া বলিল, "বৌদিদি, তারা বল্লে তোমার ঘরেই ত তোমার সব জিনিস-পত্র রেখে গেছে—দেখ দেখি ওঘরে আছে কি না?"

রাজকুমারী জানিত তাহার জিনিস-পত্র পাশের ঘরেই রাখিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্যামাকে একটা অছিলা করিয়া সে স্থান হইতে সরাইয়া দিয়া নিজ গৃহ নিজ হস্তেই পরিষ্কার করিয়া লইল।

শ্যামা ঘরে ঢুকিয়াই সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়া বলিল, "ওমা, বৌদিদি, মুখে জল দেওয়া গেল—নিজেই ঘর পরিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। আমাদের হুকুম করলেই ত হইত গা।"

এমন সময় রাজকুমারী তাহার পেট্রা হইতে একখানি কাপড় বাহির করিয়া শ্যামাকে দিয়া বলিল, "দেখ্ শ্যামা, তোর জন্যে কেমন একখানি কাপড় এনেছি, পছন্দ হয় ত?"

শ্যামা এক গাল হাসিয়া বলিল, "তা বউদিদি, তোমরা দেবে না ত আর কে দেবে বল। তুমি রাজার মেয়ে—রাজার বৌ, আমরা তোমাদের দাসী—তোমাদের নিয়ে থাচ্ছি, তোমরাই দিচ্ছ তাই পরছি। বা বেশ বৌদিদি, এখানা যে বেশ ভাল দেশী কাপড় দেখছি। আহা ভগবান্ করুন এই বছরের মধ্যে তোমার একটা খোকা হ'ক, আমি মানুষ করে জীবন সার্থক করি।"

আবার বলিল, "সত্যি বলছি বৌদিদি—তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ—ছিলে রাজকুমারী, হয়েছ দেবকুমারী, ছিলে মানবী, হয়েছ দেবী। তুমি কি আমাদের সেই বৌদিদি গা?"

দাসী মূর্খ—মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহাই বলিয়া ফেলিল—মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে শিখে নাই। তাই স্পষ্টাপষ্টী বলিয়া ফেলিল—"কি ছিলে আর কি হয়েছ!"

রাজকুমারী সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "চল্ শ্যামা, চল্, হাতে মুখে জল দিয়ে আসি।"

এদিকে সনৎকুমার পুতুলটী পাইয়া একে ওকে যা'কে দেখে তাহাকেই পুতুল দেখাইয়া বলে—"দেখ, আমার বৌদিদি আমাকে কেমন পুতুল দিয়েছে।" অন্যান্য সকলের সঙ্গে রামমণিকেও দেখাইল। রামমণি তাহার কথায় কোন উত্তর দিল না। সনৎ তখন এক ছুটে হৈমবতীর নিকট গিয়া পুতুল দেখাইয়া বলিল "দেখ মা'া, বৌদিদি আমাকে কেমন একটা পুতুল দিয়েছে!"

হৈমবতী বলিল "দেখ্‌লি, আমাদের বৌমা কেমন দাতার মেয়ে?"

সনৎকুমার বলিল "হুঁস--সে ত আমার বৌদিদি, আমায় দেবে না?" এই বলিয়া দে ছুট্।

এমন সময় রাজকুমারী মুখ হাত ধুইয়া অন্য আর একখানি কাপড় পরিধান করিয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া বসিল এবং বসিয়াই বলিল—"হাঁ মা, কৈ ঠাকুরঝিদের দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন মা?—তাঁরা বুঝি আমায় ভুলে গেছেন।"

হৈমবতী—বালাই তোমায় ভুলে যাবে কেন মা—তারা দু'জনে রঘুনাথপুরে বিয়ে বাড়ী নিমন্ত্রণ গেছে।

রাজকুমারী—তাঁরা কবে আসবেন মা?

হৈমবতী—বোধ হয় কাল কি পরশুর মধ্যেই আসবে।

এমন সময় রাজকুমারী, তাহার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর মাথার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিল, যে তাঁহার কেশবিন্যাস হয় নাই। তাই বলিল—হাঁ মা ঠাকুরঝিরা নাই—তাই বুঝি চুল বাঁধিবার সময় পান নাই।

এই বলিয়া সে তাঁহার চুল কুলাইয়া কেশবিন্যাস করিতে লাগিল। এমন সময় রামমণি সনৎকুমারের নিকট হইতে রাজকুমারীর আগমনের কথা শুনিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল—রামমণি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"চির এয়ো স্ত্রী হও মা—সাবিত্রীর মত সাধ্বী-সতী হও মা।"

তাহার পর তাহার বাপের বাটী সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া বলিলেন—সন্ধ্যা হয়ে এল মা—এখন শ্যামাকে নিয়ে সব ঘরে সন্ধ্যা দিতে হইবে—বলিয়া চলিয়া গেলেন, রাজকুমারীও শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ঘরে গিয়া ধূপ ধুনা দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া শাঁখ বাজাইল। হৈমবতী বলিল "তুমি মা আর কষ্ট করছ কেন—তুমি ঘরে যাও, আমি সব ঠিক করছি।"

এমন সময় পাঁচকড়ি রায় মহাশয় বাটী আসিলেন। রাজকুমারীও তাঁহার আগমনের বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার গৃহে গিয়া শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

পাঁচকড়ি। "এই যে বৌমা এসেছো, বেশ বেশ, কখন এলে মা, এতটা পথে আসিতে তো কোন কষ্ট হয় নাই? আমার বৈবাহিক মহাশয় কেমন আছেন, বিয়ান ঠাকুরাণী কেমন আছেন, তুমি কেমন আছ মা—" ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন এক নিশ্বাসে করিয়া বসিলেন।

রাজকুমারীও ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার পর বলিল—"আজ রাঘববলপুর হইতে আসিবার সময় বাবা আমায় অনেক করে বলে দিলেন যে, আপনাকে আমাদের বাটীতে পায়ের ধুলা দিতে হইবে। আর আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, যেমন করে হক্ আপনাকে সেইখানে একবার পাঠাতে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কি একবার আমাদের সেখানে যাবেন না?

রায় মহাশয়। সে কি মা, তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী। 'মুক্ত' হয়েছিল বলে, তাইতে তোমার মত মাণিক পেয়েছি। তোমার বাপের বাটী যাব সে কি আর বেশী কথা। তোমার বাবা আমার বৈবাহিক—পরম আত্মীয় তাহার বাড়ী যাব না ত যাব কোথা?

এইরূপ দুই একটী কথা কহিয়া, রায়মহাশয় ঠাকুর দণ্ডবৎ করিতে গেলেন। রাজকুমারীও সেই অবসরে নিজ কক্ষে গিয়া একবার এটা, একবার ওটা করিয়া নানা জিনিসপত্র নাড়িতে লাগিল, কিন্তু কোনটাই তার পছন্দ হইলনা। এমন সময়ে মনে করিল, কে যেন আস্‌ছে— কিন্তু দেখিল কেউ নয়।

অবশেষে টেবিলের উপর হইতে "মেঘনাদ বধ" কাব্যখানি লইয়া এ-পাতা ও-পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সীতা ও সরমার কথোপকথনটা তাহার চোখে পড়িল—

রাজকুমারী মৃদু মন্দ স্বরে পড়িতে লাগিল—

"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী
রঘুকুল বধূ আমি;—কিন্তু এ কাননে
পাইনু—সরমা সই—পরম পিরীতি,
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুল কুল নিত্য নিত্য কহিব কেমনে?"

এমন সময় মুক্তেশপ্রকাশ ঘরের মধ্যে রাজকুমারীর স্বর শুনিতে পাইয়া ধীরে ধীরে চুপি চুপি আপন কক্ষদ্বারে আসিয়া একমনে শুনিতে লাগিলেন— রাজকুমারী পড়িতে লাগিল—

"সরসী আরসী মোর—তুলি কুবলয়ে
অতুল রতন সম পরিতাম কেশে,

সাজিতাম ফুল সাজে, হাসিতেন প্রভু
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।"

মুক্তেশপ্রকাশ আর থাকিতে পারিলেন না; একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

সত্য, সত্য, বনদেবী তুমি সুলোচনে,
এ নহে কৌতুক বাণী, নহে পরিহাস।
কে হেন রূপসী বল হেরেছে ধরায়
মানবীর মাঝে?—হেরি যার মুখশশী
ছুটে আসে দেবগণে ত্যজি ত্রিদশ আলয়।
কুন্তলে শোভিছে যার গোলাপ চম্পক
হৃদি'পরে শোভে পুনঃ মল্লিকা মালতী
মধুমাখা মুখ যার সুধামাখা বাণী
সে যদি না বনদেবী—বনদেবী কেবা?
আহা কি মধুর বাণী পশিলা শ্রবণে
সুধা বরষিল বুঝি সুধাকর হতে!

রাজকুমারীর চমক ভাঙ্গিল—অমনি দ্রুতপদে গিয়া স্বামীর পদযুগে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধুলি লইয়া আপন মাথায় ধারণ করিল।

মুক্তেশ কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন—ভাবিলেন, আজি আবার একি লীলা! যে এতদিন ধরিয়া আমায় তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছিল, সে আজ পদধূলি গ্রহণ করিল। এ স্বপ্ন, না সত্য!

যাহা হউক, পরক্ষণেই মুক্তেশ তাহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং দেখিলেন, রাজকুমারীর চোখে জল। বলিলেন "এ কি কাঁদিতেছ কেন?

আমি ত তোমায় কোন কটু কথাও বলি নাই—তবে কান্না কিসের ?"

রাজকুমারী গদগদ স্বরে বলিল—"স্বামিন্ ! আমায় ক্ষমা করুন, আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এতদিন ধরিয়া আপনার প্রাণে যত কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য আজ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আপনার মনে কত কষ্টই দিয়াছি, তথাপি আপনি আমায় একদিনের জন্যও তিরস্কার না করিয়া নীরবেই সকল সহ্য করিয়াছেন। বুঝিয়াছি আপনি দেবতা; আর আমি সামান্যা মানবী। আমি কোন মতেই আপনার যোগ্যা নহি—আজ আমায় ক্ষমা করিয়া আপনার পদপ্রান্তে স্থান দিন।"

এই বলিয়া রাজকুমারী তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

মুক্তেশ তাহাকে পুনরায় উঠাইয়া আপন পার্শ্বে বসাইলেন; আর দেখিলেন, তখনও তাহার চোখে জল।

মুক্তেশ। ছি, আজ এই মিলনের দিন কি কাঁদিতে আছে ?

রাজকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বল, তুমি আমার সকল দোষ ক্ষমা করিলে ?

মুক্তেশ। ক্ষমা ত করিয়াছি।

রাজকুমারী। বল, আজ হইতে তুমি আমাকে তোমার যোগ্যা করিয়া লইবে ?

মুক্তেশ। লইব।

রাজকুমারী। লইবে।

মুক্তেশ। লইব। "লইবে ?" এ কথা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। উভয়ে উভয়ের যোগ্য হইব—এ ত ভাগ্যের কথা।

তখন রাজকুমারীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল—মনে সুখের উদয় হইল—মুখে হাসির রেখা দেখা দিল।

এমন সময় দূর হইতে শব্দ আসিল—"শ্যামা, বৌমাকে ডেকে আন্‌ত—বৌমার এখন খাওয়া হয় নাই, কখন এসেছে, আহা ছেলেমানুষ—"

ঐ শব্দ শুনিবামাত্র রাজকুমারী লজ্জায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তেশ পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। আর রাজকুমারী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট চলিয়া গেল।

* * * *

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রাজকুমারী গৃহে ফিরে আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামী চেয়ারে বসিয়া, আপন ফটোখানি ফুল দিয়া কেমন সাজান হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছেন।

রাজকুমারীকে দেখিয়া, মুক্তেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ কি, ফুল দিয়ে আবার সাজান হইয়াছে ?"

রাজকুমারী—সাজান নয়, পূজা করা হয়েছে।

মুক্তেশ—যা হক, আজ কি সৌভাগ্যবলে রাঘববলপুরের সূর্য্যদেব রঘুনাথবাটীর গগনে উদয় হল ?

রাজকুমারী। রাঘববলপুরের সূর্য্যদেব নিজবলে রঘুনাথবাটী জয় করিয়াছে। তাই সে আজ নিজ জিতরাজ্যে কর আদায় করিবার জন্য রঘুনাথবাটীতে উদয় হইয়াছে। তবে সূর্য্যদেব না বলিয়া চন্দ্রদেব বলিলে ভাল হইত।

মুক্তেশপ্রকাশ। রশ্মি তেমন কোমল না হইয়া একটু খর উষ্ণ, তাই চন্দ্রদেব না বলিয়া সূর্য্যদেব বলা হইয়াছে।

রাজকুমারী। অপরের কাছে উষ্ণ হইতে পারে, তোমার কাছে কি কোমল নয়?

মুক্তেশ। এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। কাজেই চন্দ্রদেব না বলিয়া সূর্য্যদেবের উপমা দেওয়া হইয়াছে। আর তুমি ত বলিলে, নিজবলে রঘুনাথবাটী জয় করিয়াছি। চন্দ্র কি বলে জয় করে?

রাজকুমারী। আমি যে বলের কথা বলিয়াছি, সে পাশবিক বল নয়। সে ভালবাসার টান। অতি ছোট হইলেও অতি কোমল। চন্দ্রদেবের রশ্মি অতি কোমল—প্রাণ মাতোয়ারা করে। তবে সে রশ্মি চন্দ্রের নিজের নহে—তোমা হেন সূর্য্যদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তবে বলিতে পার, মাঝে মাঝে রাহুগ্রস্ত হয়।

মুক্তেশপ্রকাশ। আমাদের রঘুনাথবাটীতে রাহু টাহু নাই।

রাজকুমারী। এ রাহু চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এ রঘুনাথ বাটীরও নয়, আর এ রাঘববল্লপুরেরও নয়। এ রাহু সুধাকরের কলঙ্ক—তাহার অহমিকা।

মুক্তেশপ্রকাশ। কলঙ্ক ভঞ্জন কর না কেন? অহমিকার অপনয়ন হউক না কেন?

রাজকুমারী। সেই জন্যই ত দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছি। আমার জয় করিবার দিক রায়বংশের মন, রায়পরিবারের ভালবাসা, তাঁহাদের স্নেহ, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ। সেই দিগ্বিজয়ের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন, তাই তোমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি।

মুক্তেশপ্রকাশ। আমি নিজেই ভিখারী, আমার কি আছে যে তোমাকে দিব?

রাজকুমারী। আমি এত বোকা ভিখারিণী নই, যে তোমার যাহা নেই তাহা তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাহিব

মুক্তেশ। তুমি কি চাও?

রাজকুমারী। তোমার সহানুভূতি। আমি রায়পরিবারের মন প্রাণ জয় করিতে বাহির হইয়াছি। বিবাহের দিন সাতপাক দিয়া তোমাকে জয় করিয়াছি, সেই দিন থেকে তুমি আমার; এখন—হে আমার তুমি, আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী, তুমি আমাকে সাহায্য কর, তোমার সহানুভূতি দ্বারা আমি রায়পরিবারস্থ সকলের মনপ্রাণ জয় করিব।

মুক্তেশপ্রকাশ। তোমার অহমিকা।

রাজকুমারী। সে কুয়াসা মাত্র।

মুক্তেশপ্রকাশ। তা হ'লেও চক্ষের আবরণ ত বটে?

রাজকুমারী। সূর্য্যের রশ্মিতে সে কুযাসা অপসারিত হ'য়ে গেছে।

মুক্তেশপ্রকাশ। এ সূর্য্যরশ্মি পেলে কোথায়?

রাজকুমারী। তোমার ভালবাসা ও অনুপমা দিদির সদুপদেশ।

মুক্তেশপ্রকাশ। যাহার উপদেশের এতদূর ক্ষমতা, তিনি অনুপমা নিশ্চয়ই।

রাজকুমারী। আর অনুপমা দিদির গুর্ব্বী মেনকারাণীর সদুপদেশ।

মুক্তেশপ্রকাশ। মেনকারাণী—তিনি হিমাচলে শোভা বর্দ্ধন করেন—তিনি মর্ত্ত্যে কেন?

রাজকুমারী। মাঝে মাঝে হিমাচলবাসিনীরা তোমাদের মধ্যে আসিয়া তাহাদের উপদেশ ও শিক্ষা বিস্তার করেন, তাই এখনো মাঝে মাঝে মর্ত্তে স্বর্গের সুখস্বাদ পাও। এতকাল তুমি তোমার কর্ত্তব্য অবহেলা

করিয়াছ। এখন আমি অনুপমাদিদি ও মেনকাদিদির সাহায্যে নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়াছি। আমি আমার নিজের সংস্কার সাধন করিব। স্বামিন্, তুমি আমায় সাহায্য কর। ভগবানের কাছে আমার মনোবলের জন্য কামনা ও প্রার্থনা কর। আমি আমার রিপুজয় করিব, আমার কর্ত্তব্যের পথে চলিব।

মুক্তেশপ্রকাশ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তথাস্তু।

* * * * *

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানান্তে রামমণির সহিত রাজকুমারী পুষ্প চয়ন করিতে গেল—সঙ্গে মাত্র এক দাসী। পূজার জন্য নানাপ্রকার পুষ্প চয়ন করিল, পরে বিল্বপত্র চয়ন করিল। তাহার পর নবদূর্ব্বাদল ও তুলসীপত্র চয়ন করিল। বিল্বপত্র হইতে ১০৮টা বিল্বপত্র বাছিয়া রাখিল। পরে হৈমবতীর পূজার ঘরে ফুল, বিল্বপত্র, দূর্ব্বাদল, তুলসী ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দনাদি ঘসিয়া পৃথক পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া দিল। আর আসন, কুশাসনাদি পাতিয়া ঘরটী ছিট্-কানি দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। খানিকক্ষণ পরে হৈমবতী আসিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার পূজার জন্য সমস্তই প্রস্তুত, আর সে সমস্ত আয়োজন তাঁহার পুত্রবধূ রাজকুমারীই করিয়াছে, তখন তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না।

রাজকুমারী আহারান্তে হৈমবতী, রামমণি, শশীমুখী ও রায় মহাশয়, অটলকুমার, হর্ষপ্রকাশ ও মুক্তেশপ্রকাশের জন্য পান সাজিয়া দিল। পান সাজাও অতি উত্তম হইয়াছিল। রামমণির জন্য পিতলের হামানদিস্তায় পান ছাঁচিয়া দিল। হৈমবতী, রামমণি ও অপর অপর সকলে তাহার

সেবায় মুগ্ধ। এখন সকলেই বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী বউ, যেমন গুণে তেমনি রূপে, বউ হবে ত এই রকমই। যতদিন যাইতে লাগিল তত তাহারা সবাই তাহাকে অধিক ভালবাসিতে লাগিল, আর তাহার গুণ রাশি ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

সত্যবতী, হেমপ্রভা, ও মনোলোভা নিমন্ত্রণ বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজকুমারী তাহাদিগকেও সেবায় মুগ্ধ করিল। তারপর শ্বাশুড়ীকে ক্রমান্বয়ে বলিতে লাগিল, প্রকাশ ও অটলকুমারের বিবাহের বন্দোবস্ত করা হউক। যদিও সত্যবতী ও শশীমুখী মুখে বলিতে লাগিল যে, তাহারা বিধবার সন্তান, অবস্থা হীন, তাহাদের এত শীঘ্র বিবাহের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মনে মনে বিবাহের প্রস্তাবে খুব খুসী। রাজকুমারী এক প্রকাশের আর অটলকুমারের বিবাহ প্রস্তাবেই সত্যবতী ও শশীমুখীকে জয় করিল। রামমণিকে জয় করিল, তাহার পান ছেঁচিয়া দিয়া, আর তাহার মাথার চুল কুলাইয়া দিয়া। হৈমবতী ও রায়মহাশয়—তাঁহারা ত রাজকুমারীর কাছে বিক্রীত হইবার জন্য সদাই প্রস্তুত। তাহাদের প্রাণপ্রতিম সুখের কেন্দ্র একমাত্র পুত্র মুক্তেশপ্রকাশের পরিণীতা পত্নী, প্রাণের অপেক্ষাও আদরের সামগ্রী। তাঁহারা রাজকুমারীকে ভালবাসিতে ও স্নেহ করিতে সদাই প্রস্তুত। রাজকুমারী সে বিষয়ে একটু সহযোগিতা করিলেই হইল। এখন বাকী রাজকুমারীর আন্তরিক চেষ্টায়, ভক্তিতে, ভালবাসায় ও সেবায় তাঁহাদিগকে জয় করা। এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে জয় করা অতি সহজ কার্য্য। হোমের জন্য ঘৃতাদি সব প্রস্তুত, একটু সামান্য অগ্নিসংযোগ হইলেই হোম শিখা দৃষ্ট হইবে। একটী দেশলাইয়ের কাঠির অগ্নিই যথেষ্ট। তাহার আন্তরিক মিষ্ট ব্যবহারে সে সকলকেই জয় করিল, খালি একটু খোঁচ রহিল মনোলোভার মনে।

বাস্তবিক রাজকুমারী মনোলোভার প্রতিও অতি উত্তম ব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু অপরাপর সকলের প্রতি তাহার ব্যবহার এত মিষ্ট বলিয়াই মনোলোভার একটু ঈর্ষা হইতে লাগিল। সকলেই এক বাক্যে রাজকুমারীর প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। ইহাই মনোলোভার ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিল। রাজকুমারীর অমায়িকতায়, সৌজন্যে ও আন্তরিক সেবায় সকলেই মুগ্ধ। মনোলোভা নিজেই মুগ্ধ; কিন্তু সকলেই একবাক্যে রাজকুমারীর প্রশংসা করে, ইহাই রাজকুমারীর প্রতি তাহার প্রধান ঈর্ষার কারণ। রাজকুমারী বুঝিতে পারিল যে, সে সকলকার মনপ্রাণ জয় করিয়াছে,—সকলকে ভালবাসায়, যত্নে ও সেবায় বাঁধিয়াছে; কেবল মনোলোভাকে নয়। মনোলোভা শিকল কাটা পাখীর ন্যায় কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। রাজকুমারী মনোলোভার কারণে একটু উদ্বিগ্না হইল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া অনুপমাকে এই সকল কথা জানাইয়া এই চিঠিখানি পাঠাইল—

ভাই অনুদিদি,

এখানে আসিয়া অবধি তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিতেছি। ভাল ফলও পাইয়াছি, সকলের হৃদয় জয় করিয়াছি। কেবল আমার কনিষ্ঠা ঠাকুরঝিকে জয় করিতে পারি নাই। আমার প্রতি তাহার কেমন একটু বেসুরোভাব দেখা যাইতেছে। যদ্দূর সম্ভব আমি তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু তাহার বদলে কি পাইতেছি? কেবল ঈর্ষা। তাহাকে কিছুতেই খুসী করিতে পারিতেছি না। এ হ'য়েছে "বাপ বল্‌তে—।" এখন উপায় কি? শুনিতেছি আমার অসাক্ষাতে তাহার মাতার কাছে আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টা। তবে কি জান "জলের চেয়ে রক্ত ত অধিক ঘন।" আমি

হ'লাম পরের মেয়ে, ছোট ঠাকুরঝি হ'লেন তাঁহার পেটের মেয়ে। আমার ভয়, সে সময় অসময়ে ক্রমান্বয়ে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া মা'র মন না ভাঙ্গাইয়া দেয়। সে যে আমার অজস্র নিন্দাবাদ করে তা নয়, তবে সকলে যখন আমার সুখ্যাতি করিতেছে, তাহার ভিতর চিম্‌টি কাটিতে থাকে। এবং সকলের অজস্র প্রশংসার সুফলটী নষ্ট করিয়া দেয়। সে যদি কেবল আমার নিন্দাবাদ করে, সে বরং ভাল; তাহাতে তত ক্ষতি হয় না। কারণ লোকে বুঝিতে পারে সে আমার বিরুদ্ধে ও বিপক্ষে। তাহা না করিয়া সে দেখায়, সে আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, আব সুবিধা পাইলেই আমার সম্বন্ধে চিম্‌টি কাটে—ইহা অতিশয় ভয়ানক ও প্রলয়ঙ্কর। ইহাকেই বলে—"বিষকুম্ভ-পয়োমুখম্"—"ভেতরে বিষের বোঝাই, সাম্‌নে পানে দুধের দোহাই।" সে একলা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কিছু বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবে না, কিন্তু আমি তাহা চাহি না। সময়ে তাহার বিরুদ্ধাচরণ আমার ক্ষতিজনক হইতে পারে। যতদূর সম্ভব সকলকেই নিজের স্বপক্ষে লওয়া উচিত। এখন কি করি, তাহা আমাকে সম্যক্ উপদেশ দিবে।

মেনকাদিদির খবর কি? সে এখন কোথায়? মেনকাদিদির বরটী এখন কেমন? সম্পূর্ণ পোষ মেনেছে ত? মেনকাদিদির কাছে চালাকী নয়। তাহার গুণে বনের পশুও বশ হয়, তা জামাইবাবু ত মানুষ। বলি, তোমার নিজের রাজত্বে কোন বিদ্রোহ ত নাই? আমার বিশ্বাস, বড় শত্রু জয় করা তত শক্ত নয়; কিন্তু পুন্‌কে শত্রু জয় করা বড় শক্ত। আমার শ্বশুর মহাশয় বলেন, রাজ্য চালান তত শক্ত নয়, যত শক্ত সংসার চালান। কারণ রাজত্ব চালাইতে কতকটা জোর জবরদস্তি চলে, কতকটা "সব দিকে নজর করিও না" ব্যবহার চলে। কিন্তু সংসার চালাইতে গেলে তাহা চলে না।

সকলের আব্দার সহ্য করিতে হইবে অথচ কাহাকেও কিছু বলিতে পারিবে না। যেমন একটু কড়া কথা বলিয়াছ, যদিও সেই কথাটী ধ্রুব সত্য, অম্‌নি আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। নিবাইতে তোমার চক্ষের অনেক জলের প্রয়োজন। যাহাই হউক উপায় ত নাই, অবাধে সহ্য করিতেই হইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। তোমাদের জামাইবাবুর আসিবার সময় হইল। তার জন্য সেজে গুজে প্রস্তুত হই। যদিও আমার প্রতি তাহার অগাধ দয়া, তবে কি জান, পুরুষ মানুষের মন, কাচের বাসনের চেয়ে ভঙ্গপ্রবণ। সময়ে সময়ে হাওয়ার ভরও সহ্য হয় না। কত আদর করিলে তবে তার পরিবর্ত্তে একটু আধটু আদর পাওয়া যায়। মেনকাদিদিকে আমার কথা লিখো, আর বোলো, আগামীবারে যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হবে, তখন তাহার মুখ থেকে জামাইবাবুর সম্পূর্ণ পরাজয়ের কথা অর্থাৎ মেনকাদিদির সম্পূর্ণ জয়ের কথা শুনিতে চাই। এরকম রমণীর হাতে পরাভব হওয়া— জামাইবাবুর কম ভাগ্যের কথা নয়। দেখ ভাই, আমার শ্বশুর বাড়ী আসা অবধি আমি এটা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে তোমাদের জামাইবাবুকে জয় ক'রে আমার কোন গুণপনা প্রকাশ পায় নাই। সে যেন হারবার জন্যই প্রস্তুত। যেমন একটু ভালবাসা, সেবা ও যত্নের ধাক্কা দেওয়া অম্‌নি সেপাইয়ের পতন। এত অনায়াসে জয় লাভে বিশেষ কিছু বাহাদুরী নাই। এ "অবলোকন, পর্য্যবেক্ষণ ও জয়।" আমি জান্‌তে চাই, তোমারও কি তাই? আর মেনকাদিদিরও কি সেই দশা? তবে কি জান, জয়ের মূল মন্ত্র শেখা চাই। যেমন শেখা অম্‌নি মন্ত্র পাঠ, অম্‌নি জয়। আর না—জুতার শব্দ পাচ্ছি। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্নেহের:—রাজু।

*　　*　　*　　*　　*

জবাব আসিল—

"মিষ্টভাষ, শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার—প্রথম।

মিষ্টভাষ, শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার—দ্বিতীয়।

মিষ্টভাষ, শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার সর্ব্বসময়ে।

তোমার প্রতি যিনি খারাপ ব্যবহার করিতেছেন, তুমি তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার কর। তাহাকে মিষ্টভাষে ও শিষ্টাচারে আবদ্ধ কর। উপকার পাইতেছ না, অধৈর্য্য হইও না; এই ঔষধ পুনঃপুনঃ ব্যবহার কর। উপকার অবশ্য পাইবে, আজ না হয় দুদিন পরে। এই ঔষধে আমার অগাধ বিশ্বাস। ঔষধ বদ্‌লাইবার প্রয়োজন নাই আমার ঔষধে বিশ্বাস রাখিও।"

রাজকুমারী উপযুক্ত রোগী, সেই ঔষধই ব্যবহার করিতে লাগিল। ফলে দেখিতে পাইল, ক্রমে ক্রমে, আস্তে আস্তে ঔষধ কাজ করিতেছে। রাজকুমারীর ঔষধে আরও বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল। কবিরাজকে ধন্যবাদ দিয়া রাজকুমারী চিঠিও লিখিল।

আজ মুক্তেশপ্রকাশের কল্যাণে ৺সত্যনারায়ণের পূজা;—হৈমবতী আজ মুক্তেশপ্রকাশের কল্যাণে উপবাস করিয়া রহিলেন। পূজা শেষ হইলে রাত্রে আহার করিবেন। রাজকুমারী গিয়া হৈমবতীর নিকট উপবাসের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। হৈমবতী প্রথমে বলিলেন, তিনি নিজে উপবাস করিয়া থাকিবেন, তাহাতেই হইবে। পরে রাজকুমারীর নির্ব্বন্ধাতিশয় বুঝিয়া তাহাকেও উপবাস করিবার অনুমতি দিলেন। রাজকুমারী এই অনুমতি পাইয়া একেবারে আনন্দে বিভোরা, তাহার আনন্দ দেখে কে!

রাজকুমারীর উপবাসের কথা শুনিয়া মনোলোভা তাহার নিকটে আসিয়া বলিল "কি বৌদিদি, তুমি উপবাস কর্‌বে না কি ? সোণার অঙ্গে দাগ পড়িবে না ? ননীর পুতুল গলে যাবে না ?"

রাজকুমারী। শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।

মনোলোভা। এ কথা কবে শিখ্‌লে ?

রাজকুমারী। এবার আসিয়া তোমারই কাছে থেকে।

মনোলোভা। তবু ভাল, তুমি স্বীকার কর্চ্ছ, আমার কাছ থেকে শেখবার তোমার আছে।

রাজকুমারী। আমি বরাবরই তাহা স্বীকার করি ও মানি, তবে দুঃখ যে তুমি আমার গুরুগিরি কর্‌তেও স্বীকৃতা হও না। কেন, আমি কি এত খারাপ ছাত্র ?

মনোলোভা। (মনে মনে) এ ছুঁড়ীটাকে এঁটে ওঠ্‌বার যো নেই। মাখনের চেয়ে নরম, হাত দিলেই হাত বসে যায়। (প্রকাশ্যে) তবু ভাল, অন্ততঃ আমার একজন গুণগ্রাহী ছাত্র আছে। বহুৎ আচ্ছা। আর মনে মনে বলিল কি ছিল, কি হল।

১২

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই।

"রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?"

এই বলিতে বলিতে রাজকুমারী বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে সুদীর্ঘ পুকুর পাড়ে, যেখানে হেমপ্রভা ও মনোলোভা সরময়দা মাখিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হেমপ্রভা ও মনোলোভার গণ্ডদেশে একটী করিয়া ঠোনা মারিল।

রাজকুমারী। "হ্যাঁলা ননদিনী, নন্দাই-সোহাগিনী, ভাই-গরবিনী, দামিনী, ভামিনী, তিড়িং তিড়িং লম্ফদায়িনী, ভাজহিংসাকারিণী, আমাকে এরকম করে ফেলে আস্‌তে হয়? আমি একা ভেবাকান্ত হ'য়ে তোমাদের অনুসন্ধানে গোয়াল পর্য্যন্ত খুঁজে, তোমাদের না পেয়ে কাজী হাউস পর্য্যন্ত যাবার মতলব করিতেছিলাম, এমন সময় মনে প'ড়ল আজ শনিবার, আজ তোমাদের দলাই-মলাইয়ের দিন, আজ আমাদের এখানে পূর্ণচন্দ্রদ্বয়ের উদয়; তোমরা চাঁদ ধরবার জন্য ফাঁদ তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত, তাই এই পুকুর বাটিতে তোমাদের সাজ সজ্জা, মাজা ঘষা দেখিতে এলাম। ভাবিলাম, দেখি যদি আবলুস কাঠ মেজে ঘসে চেক্‌নাই করিয়া দিতে পারি।" এই বলিয়া রাজকুমারী হেমপ্রভার হাতে পিঠে ঘস্‌ ঘস্‌ করিয়া সর ময়দা মাখাইতে সুরু করিয়া দিল।

হেমপ্রভা। ছাড় ভাজ-ঠাকরুণ, তোমাকে আর আমার জন্য এত দূতীগিরী কর্‌তে হবে না। ভয় কি জান, তুমি আকাশে উদয় হ'লে, আমরা জুনিপোকা হয়ে যাব। কখন আছি, কখন নেই। তোমার ঠাকুর জামাইয়ের তুমি তখন একছত্র রাজা, তারা ডগ্‌বগে ঘোড়া, তুমি মুখে লাগাম লাগাও, আর চাবুকের আওয়াজ কর, তারা তখন তোমার কাছে ভেড়াটির মতন হইয়া থাকিবে। তোমার ঘরের মেনী বেড়াল, তোমার হাত চাটিবে আর মেও মেও করিবে।

রাজকুমারী। বটে বটে, বুকে হাত দিয়া দেখ দেখি—হিয়া দুর্ দুর্ করিতেছে কি না ; বলি তাহ'লে তোমাদের দশা কি হবে ?

মনোলোভা। আমাদের দশা "আপনার পাঁজি পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞি বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।"

রাজকুমারী। তা কেন ? তখন তোমার দাদার ঘর খালি থাকবে। দুজনে মিলে দাদাকে ভাগ ক'রে নিও, না হয় পালা ক'রো।

মনোলোভা। তোমাদের রাঘববলপুরের নিয়ম রাধানাথবাটীতে খাটে না। আমাদের এদেশের নিয়ম, যাহার যাহা কিছু ভাল আছে, পরকে দিয়ে ফতুর।

রাজকুমারী। তা কতকটা বুঝতে পারছি, তা না হ'লে তোমার দাদা কেন আমাদের দেশে যাবে ? বাটীতে এমন সোণার চাঁপা থাকতে নজর পড়বে কেন সিউলি ফুলে ?

এইরূপে তিনজনে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রাজকুমারী তাহার দুই ননদিনীকে বেশ করিয়া সরময়দা ঘসিয়া ও বেসম মাখাইয়া চেকনাই করিতে লাগিল।

হেমপ্রভা ও মনোলোভাও ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারাও রাজকুমারীর চুলের বোঝা বেসম দিয়া ঘসিয়া বেশ সাফ করিয়া দিল। মুখে, গায়ে, হাতে, পায়ে, পিঠে সরময়দার সাহায্যে সমস্ত শরীর মসৃণ ও চেক্‌নাই করিয়া দিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে যখন সন্তরণাদির পর জল হইতে উঠিল, তখন তিনটীকে তিনটী জল-পরী বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। তিনটীই স্বভাবতঃ সুন্দরী, তাহার উপর মাজাঘষায় তাহাদের সৌন্দর্য্য আরও উথ্‌লাইয়া পড়িতেছিল। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তাহারা স্বর্গের জীব, শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে আসিয়াছে।

ইহার পর রাজকুমারী নিজ হাতে হেমপ্রভা ও মনোলোভার মনের মতন করিয়া কেশ বিন্যাস করিয়া দিল। নাকের উপর ভ্রূযুগের মধ্যে একটী টিপ পরাইয়া বলিল, "আমার এই ভুবনবিজয়ী-রূপরাশিধারিণী ননদিনীর কাছে ঠাকুর জামাইরা যদি না বিজিত হন, তবে বুঝিব বই প'ড়ে প'ড়ে তাঁহাদের প্রাণের রসকস সব শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিজিত হইবার ক্ষমতা একেবারেই নাই।"

মনোলোভা। তোমার সে সব ভাবিবার প্রয়োজন একেবারেই নাই। তোমার ঠাকুর জামাইগুলি দেখ্‌তে ভিজে বিড়াল, কিন্তু ছেলে খাবার রাক্ষস।

রাজকুমারী। তা ভাই, তাদের দোষ দেওয়া তোমার একেবারেই অন্যায়। এই এখন সেজেগুজে তোমরা দু'বোনে যেরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, আমি মেয়ে মানুষ, আমারই মনে হয় স্পঞ্জ রসগোল্লার মতন তোমাদের গিলে ফেলি, তা ঠাকুর জামাইরা ত পুরুষ মানুষ।

হেমপ্রভা। সাবধান, দাদা না তোমায় গিলে ফেলে।

রাজকুমারী। দূর, নন্দাই-সোহাগী! এত ভাগ্য কি আমার যে তোমার দাদা আমায় পায়ে স্থান দিবেন?

মনোলোভা। ওমা, বৌদিদির নম্রতা দেখ। দেখলো বৌদিদি, যা কর তা কর, দাদার দাদাত্বটুকু বজায় রেখো। তুমি এবারে যে রকম আড়ে-হাতে লেগেছ, দাদাবাবু যেন তোমার ভালবাসায় ও সেবায় বানের জলে ভেসে না যান; তোমার পাদপদ্মে দাসখত না লিখে দেন।

হেমপ্রভা। আমার দাদাকে দাসখতে সহি করান বেশী বাহাদুরীর কাজ নয়। তিনি ত দাসখত লিখিতে সদাই প্রস্তুত, তবে সে রকম মনের মানুষ পান নাই তাই।

রাজকুমারী। তা ননদিনী, তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে তোমার যে মত, তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব।

হেমপ্রভা। তা' হলে সৎসাহসের ও স্পষ্টবাদের জন্য তোমাকে একটা সন্দেশ বেশী দিবেন।

রাজকুমারী। তোমাদের বাক্য-সুধার চেয়ে কি সন্দেশ মিষ্টি?

মনোলোভা। তবে এবার থেকে সন্দেশের বদলে বাক্য-সুধা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রো।

রাজকুমারী। বাক্য-সুধায় বেশ তৃপ্তি।—দুঃখ, লোকে তাহা বোঝে না।

এমন সময়ে শ্যামাদাসী আসিয়া বলিল "অ বৌদিদি, মা ঠাকুরাণী বকিতেছেন; এতক্ষণ জলে থাকিলে যে অসুখ করিবে।" তখন সকলে মিলিয়া বাটীর মধ্যে গেল।

* * * * *

এবার শ্বশুরবাটী আসিবার পর রাজকুমারীর কথাবার্ত্তার সুর সম্পূর্ণ

বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। স্বামী তাহার অপেক্ষা অনেক উচ্চ, অনেক বড়। সে এমন স্বামীর উপযুক্তা নয়, এমন শ্বশুর শাশুড়ীর উপযুক্তা নয়। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সে অপকৃষ্টা—এই সুরে কার্য্যারম্ভ, ফলও তদ্রূপ হইল।

কিছুদিন পরেই স্বামী দেখিলেন, তাহার অহমিকার একেবারে লোপ হইয়াছে, সে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর সুখশান্তির দিকে নজর দিতেছে। কিসে স্বামীকে সুখী করিবে সেই দিকেই চেষ্টা, সেই দিকেই যত্ন; রাজকুমারীর সকল কার্য্যেই ও সকল বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ফল তদ্রূপ হইল। রাজকুমারী আত্মত্যাগ করিয়া স্বামী ও অপর সকলকে জয় করিল, স্বামী শ্বশুর, শাশুড়ী ও অপর সকলকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইল, নিজে শান্তি পাইল, নিজে জয়ী হইল।

পাঠক পাঠিকা, যদি প্রকৃত সুখী হইতে চাও, আত্মোৎসর্গ করিতে শেখ। অপরকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হও। ভগবানের রাজ্যে নিজে সুখী হইতে হইলে অপরকে সুখী করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, আত্মবলি দিতে হইবে, তবে তুমি অপরকে জয় করিতে পারিবে। এই জীবন-যুদ্ধে উদ্ধত উগ্র স্বভাবকে বলি দিতে হইবে, স্বার্থের মাথায় পদাঘাত করিতে হইবে, আপনাকে পরের সুখের জন্য উৎসর্গ করিতে হইবে, তবে তুমি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে। তোমার আভ্যন্তরিক রিপুদলকে দলন ও পেষণ করিতে হইবে, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদিকে পদতলে দলিত করিতে হইবে, তবে তোমার জয় হইবে। সকলকে জয় করিতে হইবে—বলে নয়,—ভালবাসায়, স্বার্থত্যাগে, আত্মবলিতে। এইরূপে সকলকে জয় করিলে তবে তুমি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবে.

তবে তুমি ভগবানের আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবে, তবে তুমি শান্তি পাইবে, তবে তোমার জীবন মঙ্গলময় হইবে।

তোমার আভ্যন্তরিক রিপুদল—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য লড়াই করিয়া, তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধেও তোমাকে জয়ী হইতে হইবে। যদি তুমি তোমার রিপুদলকে জয় করিতে না পার, তবে তোমার পরাজয় হইবে; তুমি পরাজিত হইলেই জীবন-সংগ্রামে তোমার হার হইবে। তুমি যদি তোমার আভ্যন্তরিক রিপুদলকে জয় করিতে না পার, তবে বাহিরে অপরকে কি করিয়া জয় করিবে? অপরকে জয় করিতে হইলে, আত্মজয়ই জয়-সোপানের প্রথম স্তর। নিজের আভ্যন্তরিক রিপুদলকে জয় করিতে না পারিলে তোমার আত্মজয় হইবে না, আর তোমার আত্মজয় না হইলে অপরকে জয় করিতে পারিবে না।

তাই বলি, সর্ব্বপ্রথমে নিজ আভ্যন্তরিক রিপুদলকে জয় করিবে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে অপরের জয় অবশ্যম্ভাবী, তোমার সুখ-শান্তি অবশ্যম্ভাবী। যেমন দুই আর দুয়ে চার হয়, ইহা ধ্রুব সত্য, তিনও নয়, পাঁচও নয়, আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কোন সংশয় নাই, সেইরূপ তোমার আভ্যন্তরিক রিপুদলকে জয় কর, তোমার সুখ-শান্তির জীবন অবশ্যম্ভাবী।

১৩
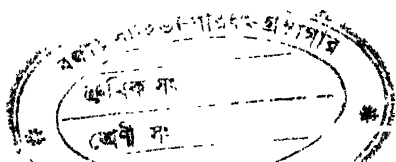
মহিলা-মজলিস্

আজ তিন দিন হইল, মিত্রজা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে মিত্রজা মহাশয় এক পয়সা পণ গ্রহণ করেন নাই, কন্যাটিকে পছন্দ করিয়া আনিয়াছেন। বৈবাহিক ইচ্ছা করিয়া যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট বৈবাহিকের কন্যাটিকে লইয়া।

কন্যাটির নাম নির্ম্মলা। তাহার পিতা রমেশ বোস একজন ভাল দরের ডাক্তার! পেশায় তাঁহার বেশ সুনাম আছে, রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীন হইলে প্রায়ই বাঁচিয়া যায়। যদিও কেহ মারা যায়, তবে ধনে প্রাণে দুদিকে মারা যায় না। তিনি চিকিৎসা করিতে গৃহস্থের বাটীতে আসিলে সে বাটিখানি ঔষধালয়ে পরিণত হয় না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দর্শনী চারি টাকা ছিল, এখনও অবস্থাবিশেষে রোগী অপারগ হইলে সেই চারি টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট। চিকিৎসাপদ্ধতিতে 'পোষ্টপন্‌মেণ্ট' নাই; যেখানে দু'দিন অন্তর রোগীর বাটীতে আসিয়া দেখিলে চলে, সেখানে তিনি দিনে তিনবার রোগী দেখিবার ব্যবস্থা করেন না। ঔষধ যত অল্প সম্ভব ব্যবস্থা করেন, আর অনেক সময়ে গাছ-গাছড়ায় কার্য্য চালান। তাঁহার নিজের শিক্ষার উপর বিশেষ আস্থা আছে। তাঁহার নিজ পছন্দ করা ঔষধের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। ঔষধ

পছন্দ করিয়া দিলে তাহাতে ফল না হইলে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হন। আর বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন করেন না। দর্শনী খুব বেশী না হওয়ায় যদিও তিনি বিশেষ ধনী হন নাই, তবু তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার রোগীরা ও তাহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও মান্য করিত। সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত, সকলেই তাঁহার ভক্ত, সকলেই তাঁহার গুণের ও সততার প্রশংসা করিত।

রমেশ বোস যে পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীর সকল লোকই সেই স্থানে তাঁহার বাসহেতু আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। কিন্তু সকলকেই কেহ সন্তুষ্ট করিতে পারে না, ডাক্তার রমেশ বোসেরও তাহাই—তাঁহার অপরাপর সমব্যবসায়ীরা সতত তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, রমেশ বাবু ডাক্তারদের পেশার এক প্রধান শত্রু,—তাঁহার ব্যবহার অপর ডাক্তারদের দর্শনী-বৃদ্ধির বিশেষ প্রতিবন্ধক। তিনি না থাকিলে তাঁহারা আরও অনেক "ফি" বাড়াইতে পারিতেন। তবে জন-সাধারণে তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিত, আর সর্ব্বদা বলিত 'ভগবান্, রমেশবাবুর মনে বল দিন, তাঁহার মতিগতি ভাল রাখুন।' সিমলার স্বনামখ্যাত ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ গোপীমোহন রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর এরূপ সদাশয় ও গরীবের মা বাপ চিকিৎসক আর জন্মায় নাই।"

রমেশ বোস তাঁহার কন্যাটীকে বিশেষ সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। সে রন্ধন বিষয়ে বিশেষ পটু, সীবন বিষয়ে ও কারুকার্য্যে বিশেষ নিপুণা, গৃহ-কর্ম্মে বিশেষ সুশিক্ষিতা, বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে বিশেষ তৎপরা।

ইংরাজি ও সংস্কৃত চলনসই জানিত। তাহার দেব দ্বিজে ও গুরুজনে বিশেষ ভক্তি। প্রত্যেক মানুষকে নারায়ণের অংশ বলিয়া জানিত। সেইজন্য নর নারায়ণের সেবায় তাহার বিশেষ আগ্রহ।

নির্ম্মলা আজ তিন দিন হইল মিত্রজা মহাশয়ের গৃহে আসিয়াছে। তাহার আগমনহেতু আজ মহিলাদের এক ভোজ। এই ভোজে বহু মহিলা আসিয়াছেন—বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা অনেকে আসিয়াছেন। যুবতী-গণের মধ্যে উপস্থিত—অনুপমা, রাজকুমারী, মেনকারাণী। প্রৌঢ়াদের মধ্যে আগতা রামমণি, কাত্যায়ণী, সুবাসিনী। বৃদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত দিগম্বরী, কিন্নরী ও জপমালা।

দিগম্বরী মাসীকে জানে না, এ গ্রামে এমন লোক নাই। গ্রামে কোন ক্রিয়াকলাপ হইলে দিগম্বরী মাসী সেখানে উপস্থিত। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে, ভালবাসে ও যত্ন করে। গতর খাটাইয়া যতদূর উপকার করা সম্ভব, দিগম্বরী মাসী তাহা করিয়া থাকেন। কাহারও বাটীতে কাজ কর্ম্ম হইলে দিগম্বরী মাসী রন্ধনশালার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নিজে রন্ধন কার্য্যে বিশেষ নিপুণা; কতিপয় প্রতিবেশিনীর সাহায্যে তিনি বড় বড় 'যগ্যি' ভুলিয়া দেন। তিনি স্বহস্তে ৬০।৬৫ রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারিতেন এবং কয়েকটী বিশেষ রসনা তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, তথাপি একগাছি চুলও পাকে নাই, একটি ব্যতীত দাঁতও পড়ে নাই। এখনও বিশেষ জোরের সহিত চাল কলাই ভাজা খাইতে পারেন, আক খাইতে বঁটির দরকার হয় না, ঝুনো নারিকেল খাইয়া বেশ হজম করেন, আধমণ ময়দা নিজে আর একটি মাত্র স্ত্রীলোকের সাহায্যে মাখিতে পারেন, ঠাসিতে পারেন ও ভাজিতে পারেন। গাঁয়ের বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সকলেই

তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনেন এবং তিনি কাহাকেও সাহায্য দানে বিমুখ করেন না।

দিগম্বরী মাসী সুভাষিণী, কোমলস্বভাবা, সদাই হাস্যময়ী, আমোদপ্রিয়া রাগ রোষের প্রতি বীতরাগ, যেখানে কলহ সেখানে দিগম্বরী মাসী তিলার্দ্ধ থাকিতে পারেন না। দিগম্বরী মাসীর লোভ একেবারেই নাই। কাজের বাড়ীতে কাজ শেষ করিয়া আসিবার সময় গৃহ-স্বামিনী তাঁহাকে বিশেষ পরিমাণে লুচি মণ্ডাদি দিয়া আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সে সব লইতে একেবারেই নারাজ। তবে গৃহ-স্বামিনার আগ্রহাতিশয্যে যদি তাহা গ্রহণ করেন, তবে কর্ম্মবাটী হইতে বহির্গত হইয়া নিজ বাটী আসিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে সেই খাদ্যদ্রব্যগুলি, যাহাদের অভাব, এমনতর বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা লোকদিগকে বিলাইয়া দিয়া যান। লোকে অনেক সময় দিগম্বরী মাসীকে বুঝিতে পারে না। দিগম্বরী মাসী পরের সুবিধার জন্য নিঃস্বার্থভাবে খাটেন কেন, তিনি শরীরপাত করিয়া জন সাধারণের সেবা করেন কেন, অনেকে তাঁহাকে এ প্রশ্ন করিলে, তিনি বলেন, "আমার শরীরে বল আছে, কার্য্য করিতে মন আছে, কার্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। আমার এমন অবস্থা নয় যে রোজ লোকজনকে আমার বাটীতে পাত পাড়াইতে পারি। এ অবস্থায়, যে পাঁচজনের সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহার সাহায্য করিলে আমার প্রাণে তৃপ্তি হয়, মনে শান্তি পাই। তবে সে বিষয়ে সাহায্য করিব না কেন?"

প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও বাটীতে ব্যারামহেতু সেবা-শুশ্রূষার অসুবিধা হইলে, দিগম্বরী মাসী খবর পাইলেই গৃহকর্ত্রীর সাহায্য করিতেন। শোকে, দুঃখে সকলেই দিগম্বরী মাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য পাইত। তিনি

প্রায়ই বলিতেন, তুমি যদি লোকের শোকে ও দুঃখে সহানুভূতি ও সাহায্য না কর, তবে তাহার সুখের সময় তাহার সহিত আনন্দ করিবার অধিকার তোমার নাই। তিনি আরও বলিতেন, মানুষকে মানুষের মত সর্ব্বদাই ব্যবহার করিবে, কোন লোক খুব মেধাবী নয় বলিয়া তুমি তাহাকে উপহাস করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবে, আর তাহার বিপদের সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, ইহা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে, তবে নীচ পশুর উপযুক্ত হইতে পারে ; মনুষ্যনামবাচ্য আত্মগরিমাযুক্ত মানুষদেহধারীর উপযুক্ত কার্য্য নয়। তুমি যে একজনকে ঠাট্টা করিয়া তাহার মনে বেদনা দিয়া অন্ততঃ তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া আনন্দ উপভোগ কর, আর তাহার বিপদে ও দুঃখে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে নূতন নূতন আমোদ উপভোগ করিতে যাও, এরূপ অমানুষিক কার্য্য তোমার উপযুক্ত নয়।

দিগম্বরী। কৈ গা, বৌমা, দেখি বাছা, তুমি কেমন লোকের মেয়ে, আমাদের ছেলেটিকে কত দিনের মধ্যে ভেড়া বানাইতে পারিবে। দেখ বাছা, আমাদের ছেলেটিকে যেন পর ক'রে দিও না।

অনুপমা। (দিগম্বরীকে উদ্দেশ করিয়া) মাসীর আমাদের কেমন কেমন কথা। তোমাদের ছেলে যদি ভেড়াজাতীয় না হয়, ত' বৌ এসে কি তাহাকে ভেড়া করিতে পারে ? তোমরা বাপু ছেলেবেলা হইতে ছেলেটিকে লালন পালন করিয়া যদি মানুষ করিতে না পার, তবে দোষ কাহার ? বল ত জপমালা পিসী, যদি ছেলেকে মানুষই করিয়া থাক, তবে একটি দুধের মেয়ে কচি বৌ আসিয়া তোমার মানুষগড়া ছেলেকে ভেড়া বা বাঁদর বানাইয়া দেয়, ইহাতে তোমাদের নিজের উপর দোষ দেওয়া হয় না কি ?

কিন্নরী। তা অনু, একটা কথা বলি মা, রাগ ক'র না। তোমরা আজ কালকার মেয়ে, তোমরা সব পার মা। কচি কচি ছেলেগুলোকে একেবারে তোমাদের হাতে মোমের পুতুলের মত কর। আমরা ছেলেবেলা থেকে তাহাকে মানুষ করিলাম, আর যেমন তোমরা গৃহে এলে, অমনি ভেঙ্গে চুরে নিজেদের মনের মত ক'রে গ'ড়ে নাও, আমরা একেবারেই থই পাই না, অকূল পাথারে ভেসে যাই, তোমরা যেমন করে ইচ্ছা তাহাদের উপর স্বত্ব স্বামিত্ব স্থাপন কর। আমরা বহু ক্লেশে ময়দা মাখিয়া রাখি, আর তোমরা তাহাতে পুতুল তৈয়ারী কর।

দিগম্বরী। তা ব'লছিলাম কি, আমাদের বৌমা কি কামরূপ কামাখ্যা প্রদেশের মেয়ে?

কাত্যায়নী। ঠিক কামরূপ কামাখ্যার না হউক, ওই পূবের বটে; যে সূর্য্যদেব কামরূপ কামাখ্যায় কিরণজাল বিস্তার করেন, তিনিই বৌমার বাপের বাড়ীর দেশে রশ্মি দেন। তবে হ'য়েছে কি জান, জপমালা পিসী, তোমাদের সময়ে কিরূপ পদ্ধতি ছিল জানি না, আমাদের সময়ে আমরা এ বিষয়ে অতিশয় হাবাগোবা ছিলাম। এখনকার যারা, তারা একেবারে ক্ষুরের ধার—যেমন গৃহে আসা, আর সব পূর্ব্ব-বন্ধন কচাকচ ক'রে কেটে দেওয়া। যখন বৌমাটী ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন তিনি খুব হুঁসিয়ার সোয়ার, স্বামীরূপ ঘোড়াটিকে জিন ও লাগামের সাহায্যে এমন করিয়া বশে আনিয়াছেন যে, চাবুক মারিতে হয় না, চাবুকের আওয়াজ করিলেই ঘোড়া গন্তব্য পথে যায়!

অনুপমা। ও দিদিমা, তোমাদের সময়ে শ্বাশুড়ীরা তোমাদের গুণের ভাগ বেশী দেখিত, না দোষের ভাগ বেশী দেখিত?

দিগম্বরী। আরে বাছা, আমাদের কথা ছেড়ে দে। আমাদের সময়ে বৌটি না চোরটি হইয়া থাকিতে হইত। সমস্ত গৃহকর্ম্মই নিজহাতে করিতে হইত। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা, দেবর ও ননদগণের ফায়ফরমাস পালন, তাহাদের দেখাশুনা আমাদের জীবনের প্রধান কাজ ছিল। দিনের বেলায় বরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ একবারেই অসম্ভব, আর তাহার সুবিধাও হইত না। সাংসারিক কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, তা' বরের সঙ্গে দিনের বেলায় ফষ্টি-নষ্টির সময় কোথায়? যখন আমার ১৬।১৭ বৎসর বয়স, তখন থেকেই হাঁড়ি ধরিতে হইয়াছে, তখন থেকে ত তোর মেসোর জন্য আমি না রাঁধিলে তাহার খাদ্যে রুচি হইত না। গৃহকার্য্য সব নিজেই করিতাম। তোর মেসো মহাশয়ের আদালতের কাপড়-চোপড় সব গোছাইয়া দিতে হইত, তাহার উপর মধ্যাহ্নের টিফিন' যোগাড় করিয়া দেওয়া—এক ডিবে পান সেজে দেওয়া, সবই নিজে করিয়াছি। কুঁড়ে লোকে আমার এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত, সহানুভূতি দেখাইত। কিন্তু কই, আমার ত কোন কষ্ট হইত না; বরং আমি বেশ সুখেই ছিলাম। আর দেখ না কেন, এখন পর্য্যন্ত কাজ-কর্ম্ম না করিলে শরীরটা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে। অপরে কার্য্য করিতেছ, আর আমি বসিয়া আছি, এরূপ দেখিলেও হাত পাগুলো নিস্ পিস্ করে।

কিন্নরী। আর দুই বৎসর আড়াই বৎসর অন্তর ছেলে বিইয়েছি—কখনও ডাক্তারের দরকার হয় নাই। আমার দুই বছুরে আণ্ডা—আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, থুড়ি রসগোল্লা দিয়ে, শত্রুকেই বা ছাই দেবো কেন বোন্, শত্রু না হলেও ত সংসার চলে না—২৬ বৎসরে বারটি খোকা খুকি বিইয়েছি। আর ষষ্ঠীর কৃপায় এখনও আমি যেওজ। তা' তারামণি পিসীই যা' করেন, কখনও ডাক্তারের প্রয়োজন হয় নাই।

জপমালা। তা হবেই বা কি ক'রে? যতদিন পোয়াতি, বরাবরই সংসারের কাজ ক'রেছি; যখন ভরা-পোয়াতি, তখন যাহাতে বেশী জোর লাগে, এমন কাজ কর্ত্তুম না, তা নইলে অল্প-স্বল্প গৃহকর্ম্ম, চলা-ফেরা প্রসবের দিন পর্য্যন্ত করিতাম। সময় হইলে ছেলে বেটা পেট থেকে বেরোতে পথ পেতো না। আর আমাদের সরমাসীর কথা মনে পড়ে। সে বড্ড কুঁড়ে ছিল। তাহার বিশ্বাস, খাটিলেই শরীর খারাপ হ'য়ে যায়, ব'সে খাইলেই শরীর ঠিক্ থাকে। ফলও তদ্রূপ, তাহার যত বিয়ান হইত, প্রত্যেক বারেই সাহেব ডাকিতে হইত। প্রত্যেক বারেই প্রসবের সময় যমে-মানুষে টানাটানি।

সুভাষিনী। আমারও বোন বিশ্বাস তাই। তবে আমাদের কর্ত্তার ধারণা অন্যরূপ। তিনি বলেন, তিনি বেশ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস, আমার বরাতেই তিনি এতটাকা রোজগার করেন, আর কথাটাও প্রকৃত তাই। তাই তিনি বলেন, গৃহকর্ম্ম চাকর-চাকরাণীতে করিবে, আমি খালি কর্ত্রীপনা করিব। আমি সেইরূপই করিতাম, প্রসবকালে কষ্টও পাইতাম। শেষে আমার এক মাসতুত ভাই ডাক্তার, তিনি পরামর্শ দিলেন, নিজে গৃহকর্ম্ম করিতে পারিলে, শরীর ভাল থাকে। তাহার পরামর্শ শুনিলাম, ফলও তদ্রূপ পাইলাম; বোকা ও মেন্টি হ'বার সময় কোন কষ্টই পাই নাই।

দিগম্বরী। তা তোমরা যাই বল, স্বামীবশ করার ঔষধপালা গাছ গাছড়া থাক্ আর নাই থাক্, মন্তর তন্তর যে আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে শিখিতে অনেক পরিশ্রমের দরকার, আর প্রয়োগ করিতেও অনেক খাটিতে হয়।

রাজকুমারী। দিগম্বরী দিদি, আমাকে ঔষধ পালা গাছ গাছড়া আনিয়া দিবে? দেখি তোমাদের জামাই যে টগ্‌বগে ঘোড়া, তাহাকে বশ করিতে পারি কি না, লাগাম চড়াইতে পারি কি না? না হয় অন্ততঃ মন্তর-তন্তরগুলি শিখাইয়া দিও!

দিগম্বরী। তোরা যে সব ডব্‌কা ছুঁড়ি, তোরা যে মন্তর-তন্তর জানিস্, আমাদেরই ভেড়া বানাইতে পারিস্। তা আমাদের নাতিগুলো ত বাচ্ছা ছোঁড়া। এই দেখ না, আমার মেনা দিদি হরিমোহনটাকে কি না ক'রলে।

অনুপমা। কি আর ক'রেছে! তাহার নিজগুণে তাহাকে মানুষ ক'রেছে। তোমরা বল, আমরা মানুষকে ভেড়া করি, কিন্তু আদত কথা অনেক সময়ে আমরা ভেড়াকে মানুষ করি।

দিগম্বরী। মেনা দিদি বয়সে বালিকা হইলেও জ্ঞানে প্রৌঢ়া ও আমাদের সেকেলে ধরণের মেয়ে। স্বামী বশ করিতে যে সব মন্ত্র-তন্ত্রের দরকার, মেনা দিদি আমার সব অভ্যাস করিয়াছে। বশ করিবার ঔষধ—স্বামীকে বেশ করিয়া লক্ষ্য করা, আর কোথায় কান্নিক খাইবে, সেই বুঝিয়া কান্নিক দেওয়া, ব্যস্। ঠিক করিয়া কান্নিক দিতে পারিলে উড়াইতে কোন কষ্ট নাই। সাক্ লাটাইয়ের সুতো ছাড় আর গুটাও—যখন যেমন দরকার। ঘুড়ি ত তোমার খেলার জিনিস, তবে খেলা জানা চাই।

মেনকা। সে কি দিদি, কষ্ট নাই? সদাই দেখ্‌তে হচ্ছে। বেশী হাওয়ার মুখে না প'ড়ে, অন্য ঘুড়ির সঙ্গে পেঁচ লাগিয়া কাটিয়া না যায়। আমরা অনেক সময় আমাদের দুঃখমোচনের জন্য নিজে কড়ে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত নাড়িতে চাই না। স্বামী কি চান তাহা বেশ করিয়া দেখিতে হইবে। কেন

তাহা চান, তাহা বুঝিতে হইবে। আর যদি তাঁহার আব্দার অন্যায় হয়, তবে যাহাতে তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। জোরের পরিবর্ত্তে মিষ্ট কথায় তাঁহাকে নত করিতে হইবে, তাঁহাকে জয় করিতে হইবে। মানুষকে চালাইবার কল, তাহার মন। তাহার মনের উপর কর্ম্ম করিতে হইবে। মানুষ লোহার যন্ত্র নয়, যে জোর করিয়া চালাইবে। ভালবাসা, যত্ন, সেবা, অধ্যবসায় মানুষকে চালাইবার প্রধান উপাদান। বীজমন্ত্র তেমন করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, এই মন্ত্র দ্বারা সব মানুষকেই জয় করা যায়, সব মানুষকেই মন্ত্রমুগ্ধ করা যায়। তবে পরিশ্রম করা চাই। যে এই খাটুনীকে ভয় না করে, তাহার পক্ষে ইহা খেলা মাত্র।

দিগম্বরী। ভাই মেনা, তুমি তোমার মন্ত্রগুলি নির্ম্মলা দিদিকে শিখাইয়া দাও, তাহাকে স্বামী বশ করিবার শক্তি দাও।

রাজকুমারী। দিগম্বরী দিদি, আমি বেশ বুঝিয়াছি আত্মোৎসর্গই স্বামী বশের প্রধান ও একমাত্র মন্ত্র। স্বামীর সুখশান্তির পদে আপনার সমস্ত বলি দাও, তবে ত তুমি তাহাকে জয় করিবে, এবং নিজেকেও সুখী করিবে—আমি অনুদিদির কাছ থেকে ইহাই শিখিয়াছি। আর শিখিয়া সেই মন্ত্র ব্যবহার করিয়াছি। ফলও পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছি। এই মন্ত্র জীবন্ত, ইহা কথা কয়, পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। সংসারকে সুখের আকর করে।

১৪

পূজাবাটীর বৈঠক

আজ সরস্বতী পূজা। প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে আজ আনন্দ কোলাহল। শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে আজ সরস্বতীর প্রতিমা পূজা। মহা আনন্দ, মহা কোলাহল। গ্রামের বালক বালিকা সকলেই আজ শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে আগত। তাঁহার বাটীতে আজ গ্রামশুদ্ধ লোক সমবেত, সকলেই আনন্দে বিভোর।

প্রত্যেক বৎসরই শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে সরস্বতী প্রতিমা পূজা হয়। প্রত্যেক বৎসরই পূজার দিনে মহানন্দে শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে গ্রামবাসী সকলেই দেবীর প্রসাদ পাইয়া আপ্যায়িত হয়।

এবার কিন্তু অন্যান্য বর্ষ অপেক্ষা অধিক ধুমধাম। শিরোমণি মহাশয় তাঁহার হারা পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার হরিমোহন এখন মানুষের মত একজন মানুষ হইয়াছেন। তিনি এখন শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ; শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার এখন বিশেষ অনুরাগ এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে পণ্ডিত মণ্ডলী একত্র হইলে হরিমোহন সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন, এখন তিনি সেই সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে আসীন হন এবং শাস্ত্রচর্চ্চায় তিনি বিশেষ মনো নিবেশের সহিত যোগদান করেন।

শিরোমণি মহাশয়ের অন্দর মহলে মেনকারাণী একাই একশ’। তিনি

আহূত, অনাহূত, রবাহূত, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী ও বালকবালিকাগণের পরিচর্য্যায় ব্যস্তা ; আর আত্মীয় কুটুম্ব ও গ্রামবাসী রমণীগণের পান-ভোজনের সুখসম্পাদনে নিযুক্তা, সকলকেই মিষ্টতা ও মিষ্টান্ন বিতরণে রতা। প্রত্যেককে সুমিষ্টান্ন দিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি ও জিহ্বার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিতেছেন, মিষ্ট সম্ভাষণে মনের ও শ্রবণের সুখ সম্পাদন করিতেছেন। সকলেই তাঁহার ব্যবহারে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট। সকলেই তাঁহার প্রশংসাবাদে রত। কে তাঁহার বেশী সুখ্যাতি করিতে পারে, তাহা লইয়া প্রত্যেকেই অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়েরা বলিতেছেন, আজ এই সরস্বতীপূজার দিনে স্বয়ং সরস্বতী শিরোমণি মহাশয়ের পুত্রবধূ-রূপে অবতীর্ণা। মেনকারাণী রূপে গুণে যথার্থই সরস্বতী।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। মা সরস্বতীর প্রসাদ লাভের জন্য অনেকগুলি ভদ্রসন্তান শিরোমণি মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে সমাবেত।

পাড়ার রামেশ্বর চাটুজ্যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ, বড় চাকুরী করেন, কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিবাস ভট্টপল্লী। বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। পৃথিবীতে অনেক দেখিয়াছেন, অনেক ঠেকিয়াছেন, অনেক শিখিয়াছেন। তথায় আর এক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, নাম রাজকুমার বোস। বয়স আন্দাজ ৬০ বৎসর, সুশিক্ষিত, পেশা ওকালতি। তিনি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে দেশে আসিয়াছেন। পেশায় তাঁর বিশেষ নামডাক ও খ্যাতি আছে, উপায়ও যথেষ্ট করেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে তাঁকে বোস সাহেব বলিয়া ডাকিত, তখন তিনি বাহ্য আচার ব্যবহারে ও পোষাকে যতদূর সম্ভব সাহেবই ছিলেন। এখন কিন্তু তিনি বোসজা মহাশয়

হইয়াছেন। তাঁহার বাটীতে এখন বার মাসে তের পর্ব্বণ হয়। তিনি প্রত্যেক পার্ব্বণে গ্রামবাসীদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী,—প্রাচ্যই হউক, আর প্রতীচ্যই হউক। তাঁহার মতে যেখানে যা ভাল জিনিস পাও, গ্রহণ কর; কোথা হইতে পাইতেছ তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল দেখ, ইহা ভাল কি না,—ভাল হইলেই গ্রহণ করিবে। তাঁহার মতে—"যেথানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পার লুকান রতন।" তিনি বলেন—দেশ কাল পাত্র ভেদ নাই, উৎপত্তিস্থল দেখিবার প্রয়োজন নাই, ভাল জিনিস দেখিলেই গ্রহণ করিবে, তাহারা স্বদেশীই হউক আর বিদেশীই হউক।

আর উপস্থিত আছেন—রামময় চন্দ্র। পেশা ব্যবসা, কলিকাতায় ইহার ব্যবসার প্রধান স্থান। ইনি কার্য্যকরী বিদ্যাশিক্ষা পাইয়া চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাহার বয়স আন্দাজ ৪০, অবস্থাও ভাল।

রামেন্দ্রসুন্দর গুপ্তও তথায় উপস্থিত আছেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। শিক্ষিত, উচ্চকর্ম্মচারী, অবস্থা ভাল। এতদ্ভিন্ন শিরোমণি মহাশয়, হরিমোহন ও গ্রামস্থ আরও অনেকগুলি ভদ্রসন্তান সেইখানে উপস্থিত।

এই সকল ভদ্রলোক শিরোমণি মহাশয়ের বাটীর বারান্দায় ও রোয়াকে ভোজন করিতেছিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রবধূ মেনকারাণী ও অন্যান্য রমণীগণ তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন।

মেনকার গাছ-কোমর-বাঁধা, তাহার হস্তে খাদ্য-দ্রব্যে পূর্ণ প্রকাণ্ড থালা। তিনি, শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত মিলিত হইয়া পরিবেশন করিতেছিলেন। সকলেই পরিবেশন করিতেছেন; তবে মেনকারাণী

অল্পবয়স্কা,—তজ্জন্ত বিশেষ ক্ষিপ্রহস্তা ও কার্য্যতৎপরা। যাহার পাতে যে সামগ্রীর অভাব, তিনি তাহাকেই সেই সামগ্রী দিতেছেন, সকলকেই সমান ভাবে পরিবেশন করিতেছেন। অনেকগুলি বালকবালিকাও সেই পংক্তিতে বসিয়াছে, তিনি তাহাদেরও পরিবেশন করিতেছেন। যিনি যে পরিমাণে খাইতেছেন, তাঁহাকে প্রত্যেকেই সেই পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী দিতেছেন।

খেচারান্ন, সাদা অন্ন ও লুচি এই তিন রকমই দেওয়া হইতেছে। সকলেই এক মনে ভোজনে রত। কিন্তু মেনকারাণীর ক্ষিপ্রহস্ত সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। যাহা প্রয়োজন সেই পরিমাণই দিতেছেন,—অনাবশ্যক হইলে অধিক পরিমাণে দিয়া পাতে রাশিকৃত উচ্ছিষ্ট খাদ্য জড় করাইতেছেন না।

রামেশ্বর। শিরোমণি মহাশয়, আপনি বিশেষ ভাগ্যবান্। এরূপ পুত্রবধূ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

রাজকুমার। সে বিষয়ে আর কথা আছে? আমাদের পুত্রবধূ আমাদের গৃহের ভবিষ্যৎ দেবী। তাহারই উপরে আমাদের গৃহের সুখ-স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে। আমাদের গৃহ সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল—তাহা আমাদের বধূগণের গুণ বা দোষের উপরেই নির্ভর করে। তবে আমরা এমনই ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছি যে, পুত্রবধূ-নির্ব্বাচনে বংশের বা গুণের নির্ব্বাচন না করিয়া অর্থেরই নির্ব্বাচন করি। ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর পিতা, মাতা ও নিকট আত্মীয় কুটুম্ব কিরূপ শ্রেণীর লোক তাহা না দেখিয়া, কন্যার পিতা কত টাকা দিতে পারেন এবং জামাতাকে কিরূপভাবে বিষয়কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখি। আমরা আজকাল টাকার মাপ-

কাটি দিয়া আমাদের সংসারের ভবিষ্যৎ সুখ মাপ করি, আর খুব দেরীতে ভুল বুঝিতে পারি; আর নিজের ধন-লোভের দোষ না দিয়া বধূমাতার দোষ দিই।

রামেশ্বর। শুধু তাই নয়,—আমরা এখন পরীর বাচ্ছা চাই, যৌতুক চাই। চাই অর্দ্ধেক রাজত্ব আর পুত্রবধূ এক রাজকন্যা—তা দেব রাজকন্যাই হউক আর দানব রাজকন্যাই হউক। বাপের কিছু টাকা থাকিলেই হইল। টাকা সদুপায়েই অর্জ্জিত হউক, আর প্রতারণা করিয়া, জুয়াচুরি করিয়া, কদাচারী হইয়া অথবা যে কোনরূপ অসদুপায়েই হউক। আমরা অর্থকেই আমাদের উপাস্য দেবতা করিয়া তুলিয়াছি; অর্থ সকল গুণের আকর, অর্থই এ জগতে চলিবার প্রধান সুখসেতু, অর্থই এখন আমাদের পরমারাধ্য ও পরমার্থ। তাহা না হইলে সেদিন একজন ধর্ম্মযাজক, পুত্র যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে যাইতেছে তখন তাহাকে পরামর্শ দিবার সময় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, যাও, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর; কিন্তু মনে রাখিও—যেমন করিয়াই পার, অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবেই, সদুপায়ে পার ত ভালই"।

রামেন্দ্রসুন্দর। আর মহাশয়, সে দিন পড়েন নাই?

এক অল্পবয়স্কা অপূর্ব্ব সুন্দরী নিজের বাগ্‌দত্ত স্বামীকে খুন করিয়া বিচারের পূর্ব্বে হাজতে বাস করিতেছিলেন। তিনি হাজত মধ্যে ৫০১ খানা চিঠি পান, তাহাতে ৫০১ জন বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক ও অল্পবয়স্ক পুরুষ তাহাকে বিবাহে আলিঙ্গন করিবার জন্তে প্রস্তাব করিয়াছেন।

রামময়। মহাশয়, দেশ হ'ল কি? দশে করে কি?

রামেশ্বর। দোষ দেশের নয়, দোষ দশের। আপনারা সকলেই যদি

বলেন—না, আমরা বিত্তের উপাসনা করিব না, আমরা বাহ্যরূপের উপাসনা করিব না, আমরা গুণের উপাসনা করিব, আমরা গুণযুক্ত রূপের উপাসনা করিব, আমরা মানুষের উপাসনা করিব, তাহা হইলে পুনরায় আমরা আমাদের পূর্ব্বসুখ ফিরাইয়া পাইতে পারি। আমরা যদি "কাজে কুড়ে খরচে গেড়ে আর বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে' দলের মধ্য হইতে বাটীতে পুত্রবধূ আনি ত, সে দোষ কাহাদের? আমরা যদি তাদের শিক্ষা দিই —গৃহকার্য্য ঝি চাকরাণীদের, গৃহকার্য্য গৃহস্থের পুত্রবধূর নয়; গৃহকার্য্য গরীবের জন্য, গৃহকার্য্য বিত্তশালীর জন্য নয়,— যদি আমরা শিক্ষা দিই বা সেরূপ শিক্ষাতে আপত্তি না করি যে, তাহার সমস্ত জীবন কেবল তাহার স্বামীর জন্য আর তাহার নিজগর্ভজাত পুত্রকন্যার জন্য,— অন্য আত্মীয়ের বা অন্য কাহারও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, এমন কি তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত তুলিবার প্রয়োজন নাই, তবে সে দোষ কাহার?

রামময়। দেখুন, আমার মনে হয়, এ সব পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। আমরা ক্রমে আমাদের রমণীগণকে মেমসাহেব করিয়া তুলিতেছি,—তাহাদিগকে ক্রমে মোমের পুতুল করিয়া তুলিতেছি। তাই ক্রমে তাঁহারা এখন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান। খানিকটা মাঠে দৌড়াইতে পারেন; কিন্তু এক সের ময়দা মাখিতে পারেন না। পুরুষদের মত তাঁহাদের ব্যায়াম করিবার সুবিধা নাই বলিয়া ব্যাধির ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যের মূল কারণ নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু গৃহ পরিষ্কার, বাটনাবাটা, কুটনা কুটা, জলতোলা, ময়দা মাখা প্রভৃতি গৃহকার্য্য, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে রাজি নন। সত্য, যাঁহারা সহরে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সুবিমল বায়ু, প্রচুর সূর্য্যরশ্মি দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালার রমণী ধরিলে শতকরা

কয়জনের এ দুর্ভাগ্য? আর যদি সহরেই থাকেন ত আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের রমণীরা—মাতা, মাতামহী, পিতামহী, প্রমাতামহী, প্রপিতামহী, খুড়ী, জেঠাই, পিসী, মাসী—যে সব গৃহকার্য্যে ব্যায়াম করিয়াছেন এবং নিজের মনের সুখে ও আনন্দে, এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের মনে সুখ ও আনন্দ দিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, সেরূপ করিয়া সুখী হইতে পারেন না কেন? সকলেরই বাটীতে ত ছাদ আছে; সেইখানেই ফাঁকা হাওয়ায় সুপারি কাটা, লেপ সেলাই, চাদর সেলাই কার্য্য করিয়া আহার ও ঔষধ দুয়েরই ব্যবস্থা করেন না কেন? গৃহকর্ম্মও হইবে আর হাওয়া খাওয়াও হইবে। খুব ভোরে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেও ত দুই কার্য্যই হয়; গঙ্গাস্নানও হয়, আর চলা ও হাওয়া খাওয়াও ত হয়। যদি বল ভোর বেলায় স্ত্রীলোকের রাস্তা চলায় অসুবিধা আছে, অপমানের ভয় আছে, সে ত সব তোমাদের নিজের হাতে; চেষ্টা করিয়া সমবেত হইয়া পাড়ার সকলে কার্য্য করিলে সে অসুবিধা দূর করা যায়। ইহার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকগণ একত্র মিলিয়া মাসে একদিন করিয়া তাহাদের মা, মাসী, খুড়ী, জেঠাই ও প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে যাইতে পারেন।

রামেশ্বর। চন্দ্র মহাশয়, আপনি শেষে যে সব কথা বলিলেন, আমি তাহার সমস্তই অনুমোদন করি। তবে যে আপনি বলিলেন, আমাদের দোষগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, আমি এ বাক্যের অনুমোদন করিতে পারি না। আমরা যদি পাশ্চাত্য শিক্ষার ভালটা না লইয়া মন্দটা অনুকরণ করি, তবে দোষ পাশ্চাত্য শিক্ষার, না আমাদের? এক সময়ে আমাদের সবই ছিল, এখন সবই হারাইয়াছি। এখন আমাদিগকে হংসের ন্যায় ক্ষীরটুকু লইতে হইবে, জলটুকু ফেলিতে হইবে,—ভালটি লইতে হইবে, মন্দটি ত্যাগ করিতে

হইবে ; আমাদের জাপানবাসীদের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। এই দেখ না, আমাদের পরিবেশন-প্রথা আর ইংরাজদের পরিবেশন-প্রথা। আমরা প্রত্যেক ভোক্তার পাতে স্তূপাকার করিয়া খাদ্য-দ্রব্য দিয়া যাই, লুচি যেখানে ভোক্তা চারি খানা খাইবে সেখানে দশখানা দিয়া যাই ; কচুরি, পাঁপর, তরকারীও তদ্রূপ ; মিষ্টান্নের ত কথাই নাই। একজন লোকের পাতে যাহা দেওয়া হয়, তাহা চারিজনে খাইয়া উঠিতে পারে না,—সিকি রকম খায়, আর বার আনা পড়িয়া থাকে। এ রকমভাবে জিনিস নষ্ট করা কি ভাল ? পূর্ব্বে যখন ঘি কুড়ি টাকা মণ ছিল, তখন আলাহিদা কথা ; এখন সেই ঘি আশী টাকা মণ। তখন একটা সন্দেশের দাম পড়িত এক পয়সা ; এখন তাহার দাম আট পয়সা। রসগোল্লারও সেই হিসাব। গৃহস্বামী অতি কষ্টে এই সব জিনিস পত্রের আয়োজন করেন ; আর এই উপরি উক্ত ভাবে জিনিস-পত্র তচ্ছরূপ হয়। ইহাই হইল আমাদের সনাতন প্রথা। আর ইংরাজদের দেখ, তোমার সামনে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া ধরিল, তুমি যাহা চাও তুলিয়া লও, অপচয়ের সম্ভাবনা খুব কম। তা বলিয়া আমি বলি না যে ঐরূপ করিয়া তুলিয়া লও। তবে এরূপভাবে খাদ্য দ্রব্যগুলি চাহিয়া লইবে যাহাতে কর্ম্মীর দ্রব্যাদির অপচয় না হয়।

রামময়। তাহার কারণ আছে। আমাদের সনাতন নিয়ম বিশেষ কারণ বিনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট থাকে, তাহা সমস্তই গরীব লোকে খাইতে পায়,—পরদিন পাড়ার কাঙ্গাল-গরীবকে বিলান হয়।

রামেশ্বর। সত্য, আমাদের সকল নিয়মই সনাতন,—উপযুক্ত কারণ ব্যতীত প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে সনাতন নিয়মের

বিশেষ কারণ ছিল, আজ সে নিয়মের কারণ তিরোহিত হইয়াছে। কারণ তখন জিনিসপত্র অনেক স্বল্প মূল্য ছিল। স্বল্পায়াসে লোকের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ হইত। বাহিরের লোক আসিয়া তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইত না,—তোমার দেশের উৎপন্ন জিনিস তোমার দেশেই থাকিত; আর দেশের লোকেই উপভোগ করিত। এখন আর সে রামও নাই, আর সে অযোধ্যাও নাই। এখন বাঙ্গলায় বাঙ্গালার বাহিরের লোকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গলার লোকে গৃহচ্যুত হইতেছে। এ দেশের লোকের এ দেশে থাকিবার স্থান নাই,—দেশের লোকের দেশের উৎপন্ন জিনিস উপভোগ করিবার সামর্থ্য নাই। এখন আর আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় নবাবী করা চলে না। প্রত্যেক সভ্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের আইন ৩০, ৪০, বা ৫০ বৎসরের মধ্যেই বদল করেন ও নূতন আইন করেন। আর আমাদের সামাজিক নিয়ম, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বদল নাই, পরিবর্ত্তনও নাই। ৮০ টাকা মণ ঘি দিয়া লুচি ভাজিয়া, ৯০ টাকা মণ সন্দেশ কিনিয়া, পরদিন তাহা গরীবদের জন্য দেওয়া চলিবে না। তুমি তাহার সিকি খরচে ভাল করিয়া গরীবদিগকে টাট্‌কা ডাল ভাত খাওয়াইতে পার, অল্প পরিমাণে মিষ্টান্ন দিতে পার। আসল কথাটা কি জান? মহাশয়, আমাদের বাঙ্গলা এমনি সুন্দর স্থান, এখানে যা একবার আসে, তা আর যেতে চায় না—তা মানুষই বল, ধর্ম্মই বল, রোগই বল, প্রথাই বল, আর চালই বল। পুরাতনের সংস্কার নাই, সে ত রহিল; আবার নূতন যাহা আসিল, তাহাও রহিয়া গেল। কোনটিকে আমরা তাড়াইতে পারিব না, কোনটিকে তাড়াইয়া তাহার স্থানে কোন কিছু নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে জানি না বা পারি না। আমরা পুরাতনকে এম্‌নি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে ভাল-

বাসি যে কোনটিকে 'চলিয়া যাও' বলিতে প্রাণে ব্যথা পাই, এমন কি নিজেদের মঙ্গলের জন্যও তাহা পারি না।

অপর পংক্তিতে অপরাপর কায়স্থ ভদ্রমহোদয়গণ ভোজন করিতেছিলেন। অল্প বেতন ভোগী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলজাচরণ ঘোষ সেই পংক্তিতে ভোজন করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। গুপ্তজা, বোসজা ও চন্দ্রজা এই পংক্তিতে ছিলেন। ঘোষজামহাশয় বলিয়া উঠিলেন —মহাশয়, আপনারা যা বলিলেন, সকলই সত্য। আপনারা বরং যাহা হয় করিয়া কর্ম্মে বিরতা, ভোগে অতিরতা, বচনে মুখরা, তীব্র শ্লেষ-বাক্যে প্রখরা, খরচে পটু, আর ব্যবহারে কটু রমণী পাইয়া অর্থের সাহায্যে সংসার চালাইতে পারেন। কিন্তু আমরা গরীব শিক্ষকের দল,—ছেলে চরাইয়া কখনও খাই, আর কখনও বা উপবাস করি; আমাদের উপায় কি ?

এই সময়ে মেনকারাণী পায়সান্ন পরিবেশন করিয়া গেল। তাহার পর সকলেই ভোজন স্থান পরিত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে সমবেত হইল। বহির্বাটীতে আসিয়া তাম্বুলচর্ব্বণ ও তামাক সেবন করিতে করিতে তাহাদের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

শৈলজাচরণ। দেখুন মহাশয়, আমাদের অর্থ সুখ একেবারেই নাই, তাহাতে বিশেষ ক্ষতিও নাই। তবে আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ এখনও বেশ আছে। আমরা যতক্ষণ বাহিরে থাকি, ততক্ষণ শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত, পরের ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। যখন গৃহে আসি, তখন গৃহিণীর সাদর সম্ভাষণে মুগ্ধ। সব ইন্দ্রিয়েরই উত্তম খোরাক প্রস্তুত। শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য মধুর সম্ভাষণ, বিশুদ্ধ আলাপন। ভূষণের জন্য ভণিতা ও আক্রমণ নাই,

বসনের জন্য বিক্রমজারি নাই। দর্শনেন্দ্রিয়ের জন্য নথবিশোভিত মুখচন্দ্র হাস্যে সদাই প্রফুল্ল; ব্যাকুল সদাই আমাকে খুসী করিবার জন্য। ভ্রূকুটীর রেখা নাই, ক্রোধের আভা নাই, ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চন নাই।

রসনার জন্য সুমিষ্ট খাদ্য সংগৃহীত। যাহা খাইতে ভালবাসি সবই প্রস্তুত, সবই তৈয়ার। অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হই, কোথা হইতে এসব আইসে। আমি ত সামান্য বেতন পাই, মাসকাবারে আনিয়া গৃহিণীর হাতে দিই, সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়। পরে মাস ধরিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় উপভোগ করি। হয় কোথা হইতে? বিবিয়ানা পত্নীযুক্ত বন্ধুবরদের কাছে যে সব খরচের হিসাব শুনিতে পাই, আর সে সব খরচ সত্ত্বেও যে সব অসুবিধা ভোগ ও কর্ম্মভোগের হিসাব পাই, তাহাতে ত চক্ষু চড়কগাছ। ভাবি, আমাদের এ সব ভোগ হয়, কোথা হ'তে? অনুসন্ধানে দেখিতে পাই—চেষ্টা, ধৈর্য্য ও গৃহকার্য্যচাতুর্য্যে। তিনি রাঁধিতে পারেন, বাটনা বাটীতে পারেন, কুটনা কুটিতে পারেন, ময়দা মাখিতে পারেন, সীবন কার্য্য করিতে পারেন, আবার অবসর মত বাবুর বিবি সাজিতেও পারেন। তাই আমার এত সুখ, এত সুবিধা। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের জন্য গৃহিণীর অবয়বের সুগন্ধ ও তাহার চুলের সুবাস অর্থাৎ মসলা-ফেলা নারিকেল তেলের সুগন্ধে মাতোয়ারা। গৃহে প্রত্যহ ধূপধুনার মনোরম গন্ধ ত আছেই। বাটীতে গৃহিণীর কার্য্যতৎপরতায় কোনরূপ আবর্জ্জনা না থাকায় দুর্গন্ধের অভাব। তাহার উপর সময়ে সময়ে শোবার ঘরের বিছানায় গোটা কতক সুগন্ধি পুষ্প, আর না হয়, ঘরে গাঁথা বেলের মালা। গৃহিণীর যত্নে বাটীতে টবের গাছে ফুল ফোটে, আর আমিও ফুটি। মহাদেবের কৈলাসের হিংসা আমি করি না, আর আমার কৈলাস

মহাদেবের কৈলাসের সহিত বিনিময় করিতে রাজি নই,—কি জানি সে কৈলাসে যদি আমার গৃহিণী না থাকেন!

স্পর্শেন্দ্রিয়,—সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যখন বাটীতে আসি, গৃহিণী আমার সাজ সজ্জা নামাইয়া লইয়া, গায়ে অতি কোমল হাত বুলাইয়া দেন। তখন আমার ত্বকের যে আরাম তাহা বর্ণনাতীত। তখন আমি সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিয়া যাই। মনে হয়, আমার চেয়ে সুখী কে? কিন্তু, মহাশয়, আর বুঝি সে সুখ থাকে না। যদিও অভ্যাস দোষে আমার থাকে, কিন্তু পুত্র পৌত্রের কোনরূপেই থাকিবে না।

রামেশ্বর। কেন হে? আর থাকে না কেন?

শৈলজাচরণ। থাকবে না আমাদের নিজের দোষে, আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার। যাহা ভাল, আমরা তাহার আদর জানি না। মহাশয়, আমার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মাহিনে পান ৩০৲ টাকা; কিন্তু তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী একটী ছোট খাট নবাব-গৃহিণী। গৃহকার্য্য কিছুই জানেন না বা করেন না। দু'টি ছেলে ও একটী মেয়ে, তাহারা একরকম আপনাপনি যতদূর সম্ভব মানুষ হয়। তিনি দেশের কাজে ও দশের কাজে ব্যস্তা, তিনি ব্যস্ত নন কেবল নিজের সন্তান সন্ততির পরিচর্য্যায়, স্বামীর সেবায়, শ্বশুর শাশুড়ীর শুশ্রূষায়। তিনি দেশের কাজেই ব্যস্তা।

সংসারে তিনি নিজে, স্বামী, দুই পুত্র, শাশুড়ী, আর এক দাসী। বুড়ী দাসীর খাটিয়া খাটিয়া প্রাণান্ত। ছেলের ১০৪ ডিগ্রী জ্বর, বড়ই ভুগিতেছে; তিনি সেই ছেলেকে বুড়ীর ও দাসীর জিম্মায় দিয়া দেশের ও দশের কাজে ব্যস্তা। তিনি আজ পারিতোষিক বিতরণের জন্য স্কুলবাটী সাজাইতে ব্যস্তা।

কাল দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা আদায়, পরশ্ব জল কষ্ট প্রপীড়িতের জন্য চাঁদা আহরণে ব্যস্তা। তিনি স্বামী, পুত্র, শাশুড়ী ও নিকট আত্মীয় স্বজনের দুঃখ মোচন ছাড়া আর সকলেরই দুঃখ মোচনে ব্যস্ত। বৃদ্ধা মায়ের অসুখ করিলে, বেচারা স্বামীকেই রন্ধনকার্য্য করিতে হয়। স্বামী তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেই তিনি অমনি বলিয়া উঠেন—"আমি তোমার মত স্বার্থপর নই, নিজের পুত্রকন্যার জন্য ত সকলেই ব্যস্ত। নিম্নস্তরের পশুজীবনও ঐরূপ কার্য্যে অতিবাহিত হয়। পরোপকারই উচ্চমনের ধর্ম্ম; আমি সেই পরোপকার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতেছি, তুমি তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না।" আমি এই সকল স্ত্রীলোককে বুঝিতে পারি না। আর তারা যে এই সব কার্য্যে পরিশ্রম করে না তাহাও নহে।

রামেশ্বর। আরে ভায়া, বুঝতে পারলে না, তারা হৈ চৈ ভালবাসে। স্বামী পুত্রের গৃহকার্য্যের সম্পাদনে দায়িত্ব আছে, সে কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ভালমন্দের দায়ী সে নিজে। ভাল করিয়া সে কার্য্য করিয়া তুলিতে না পারিলে দায়িত্ব তাহার নিজের। সে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে নারাজ। প্রাণপণ করিয়া সংসারের কার্য্য কর,--তুমি যে তোমার স্বামীকে পুত্র কন্যাকে ও আত্মীয় স্বজনকে সুখে রাখিয়াছ, ইহাই তোমার পুরস্কার। খবরের কাগজে তোমার স্তুতিবাদ হয় না, লোকে তোমাকে ধন্য ধন্য করে না, তোমার সুখ্যাতির ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হয় না, তোমার স্বামীর পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়া নিজের মনের সুখ ও আত্মপ্রসাদলাভ ছাড়া অন্য কোন প্রশংসালাভ ঘটে না। ইহা এই জাতীয় স্ত্রীলোকদের জীবনের পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজক কর্ত্তব্য নহে।

রাজকুমার। কি জান ভায়া, আর এক বিপদ---মিথ্যা সাম্যবাদের ধোঁয়া, সাম্যবাদের নামে যথেচ্ছাচারিতা। তুমি পুরুষ, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি স্ত্রীলোক, আমি তাহা পারিব না। তুমি গৃহকর্ম্ম না করিলে সংসার চলে, আর আমি না করিলেই সংসার চলে না। আমি তবে গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্মে জীবনপাত কেন করিব? মহারাজ কর্পূরতলা এই সব উপভোগ করিতেছেন, আর আমি শ্যামচাঁদ রায়, আমি সাওয়ালেসের আফিসে সারাদিন কলম পিষিয়া খালি ছেলে মেয়ে স্ত্রীপরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিব, তাহা কেন হইবে? ইহা অতি অন্যায়। সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেল, সকলকে সমান অধিকার দাও,—আমাকে তুলিতে না পার, কর্পূরতলার মহারাজকে নামাইয়া দাও।

এই প্রকার সাম্যবাদীরা একবারও ভাবেন না যে, এরূপ সাম্যবাদ ভগবানের অভিপ্রেত নয়। ভগবান্ সৃজনে সব একরূপ করেন নাই। উদ্ভিদ জগতে দেখ, সব গাছ একরূপ নয়, সব রকম রকম। কোন গাছ ছোট, কোন গাছ বড়, কোন গাছ কর্কশ, কোন গাছ মসৃণ, কোন গাছের ফুল ছোট, কোন গাছের ফুল বড়, কোন গাছের ফুল কদাকার, কোন গাছের ফুল দেখিতে অতি মনোরম, কোন গাছের ফুল সুগন্ধময়, আবার কোন গাছের ফুল দুর্গন্ধজনক; আবার কোন গাছের ফুল সুগন্ধময়ও নয়, আর নয়নরঞ্জনও নয়। সেইরূপ পশুজগতে বলশালী ও দুর্ব্বল, সুন্দর ও কদাকার, বৃহদাকার ও খর্ব্বাকার সকল প্রকারেরই বিভিন্ন শ্রেণীর পশু আছে, ও সকলেই নিজের নিজের কার্য্য করে।

এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন রকমের,—সব একরূপ নয়। কোথাও সমতল ভুমি, কোথাও উপত্যকা, কোথাও অধিত্যকা,

কোথাও পাহাড়, কোথাও খাদ, কোথাও গভীর জল, কোথাও খুব নিম্নভূমি ; সব সমান নয়। এইরূপ বিভিন্নতা ভগবানের সৃষ্ট জিনিসেই দৃষ্ট হয়। আবার মানুষ সব এক রকমের নয়---দীর্ঘকায় পেশোয়ারি আফগান্, হাইল্যাণ্ডার, নাসিকাহীন চীনে, উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট আর্মেয়ান, খর্ব্বাকৃতি গুর্খা, শ্বেতবর্ণ ইংরাজ, কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো। ইহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ভগবান সকলকেই সমান করেন নাই এবং সকলকে একপ্রকার করা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

রামময়। তা' নিশ্চয়ই। তা' নইলে, শুধু স্ত্রীলোকই সন্তান প্রসব করে কেন ? পুরুষেরও সময়ে সময়ে সন্তান প্রসব করা উচিত ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর। আরে ভাই, আর লোক যে কেবল বলে, আমাদের যেটা খারাপ হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। পাশ্চাত্যের কাছে শিক্ষা করিবার অনেক ভাল জিনিস আছে। তাহা না শিখিয়া আমরা খালি তাহাদের দোষগুলির অনুকরণ করি। ইংরাজ রমণীরা কি তাহাদের নিজের দেশে গৃহকর্ম্ম করে না ? সকলেই করে। মধ্যবিত্ত যত ইংরাজমহিলা আছে, তাহারা সকলেই নিজের নিজের দেশে গৃহকর্ম্ম করে। সকলেই গৃহ-মার্জ্জন, রন্ধন, বস্ত্র পরিষ্করণ, বস্ত্রসীবন, গৃহপ্রক্ষালন, সন্তান সন্ততির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষণ, তাহাদের বস্ত্রাদির পারিপাট্য সাধন, সূচিকার্য্য করণ, বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষপালন, আর শয়নকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ ও রন্ধনশালার পারিপাট্য রক্ষণ—এ সমস্তই তাহারা স্বহস্তে করিয়া থাকে। তবে তাহারা যে এদেশে আসিয়া নিজের হাতে সে সব করে না, তাহার কারণ তাহাদের স্বামীগণ এখানে আসিয়া অনেক অধিক উপার্জ্জন করে, আর এখানে চাকর চাকরাণীদের মাহিনা অতি অল্প। আমাদেরও মহাপ্রভুরা যখন দেশ

ছাড়িয়া বিদেশে অধিক বেতনে কার্য্য করেন বা অধিক উপায় করেন, তখন তাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা তাঁহার আয়ের অর্দ্ধাংশের অধিক খরচ করেন ; আর নিজ হাতে কিছু করেন না, দাসদাসীর উপরই নির্ভর করেন। সে স্বতন্ত্র কথা, সে নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যত্যয়।

আরে ভায়া, শুনেছ কি ? আমেরিকায় একদল রমণী আছেন, যাঁহারা সভা সমিতি করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর সন্তানের ভার গর্ভে বহন করিবেন না। তাঁহারা সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই সাম্যবাদের দিনে কেন তাঁহারা সন্তান গর্ভে ধারণের কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিবেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের মত কার্য্যে পরিণত করেন, তাহা হইলে বিষ্ণুঠাকুরকে একটু ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, ব্রহ্মাঠাকুরকে সৃজনের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে ; নতুবা সৃষ্টি থাকিবে না, প্রলয় খুব নিকটবর্ত্তী হইবে।

রামেশ্বর। আরে ভাই, আমরা নিজের পায়ে, নিজে কুঠার মারিতেছি। আমাদের যা' নিজস্ব ভাল ছিল, তাহা আমরা হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক ঘরেই মেনকারাণী বিরাজ করিতেন, আমাদের প্রত্যেক বাটীতেই মেনকারাণীর উজ্জ্বল জ্যোতিতে গৃহ উদ্ভাসিত হইত। এখন মেনকারাণীর দল কমিয়াছে ; তাহা আমাদের নিজের দোষ। এখন যে আমরা একটি মেনকারাণী দেখিলে এত উল্লসিত হই, সে আমাদের নিজের কর্ম্মফল। এখন যদি কোন ছেলে মাতাকে ভক্তি করিল, তাহাকে মাতৃভক্ত বলিয়া তাহার সুখ্যাতিতে গগন বিদীর্ণ করি ; পুত্র পিতাকে ভক্তি করিলে, অবাক্ হইয়া তাহার প্রশংসায় ব্যস্ত হই। চাকর প্রভুভক্ত হইলে সে বিশেষ প্রশংসাভাজন হয় ; স্ত্রী স্বামীকে ভক্তি ও সেবা করিলে, নিজের গৃহের

গৃহকর্ম্ম নিজহস্তে করিলে, সে স্ত্রীলোক আদর্শ চরিত্র হয়। সে দোষ কাহার? সে দোষ আমাদের,—আমাদের শিক্ষার দোষ, আমাদের শিক্ষা দেওয়ার দোষ, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির দোষ। আমরা ধ্রুপদ খেয়াল ভালবাসি না, আমরা ছুটা টপ্পা ভালবাসি। প্রত্যেকেই যদি আমরা গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও সদ্‌গুণসম্পন্না না হইলে গৃহলক্ষ্মীগণকে গৃহে না আনি, তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের প্রতি গৃহ পূর্ব্বের ন্যায় মেনকারাণীতে ছাইয়া যাইবে,—প্রতি গৃহেই আমরা গৃহলক্ষ্মী দেখিতে পাইব। আমাদের নিজস্ব পূর্ব্বপুরুষের ত্যক্ত সম্পত্তি আমরা আবার উদ্ধার করিতে পারিব। ভগবান্ কি আমাদের সেই দিন দিবেন।

রামময়। ভাই, যদি আমাদের কিছু নিজস্ব সম্পত্তি থাকে, ত সে আমাদের হিন্দু সহধর্ম্মিণী। এ অমূল্যধন পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্তব্য নয়। স্বামী যাহাই হউন—ধনী বা নির্ধন, রূপবান্ বা কুরূপ, গুনবান্ বা নির্গুণ, মধুর স্বভাব বা ক্রোধী, নিষ্কর্ম্মা বা কর্ম্মিষ্ঠ, উন্নতমনা বা নীচমনা—সে তাহার স্ত্রীর উপাস্য দেবতা, তাহার স্ত্রীর কৈলাসপতি, কৈলাসনাথ, আর তাহার স্ত্রীর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বগের সুফল। এ শিক্ষা আর কোন দেশে আছে? সে কথার পুঁটুলি নয়, কার্য্যে পাঞ্চালী। এই রমণী যাহার গৃহলক্ষ্মী, তাহার আবার অভাব কিসের? যতদিন এইরূপ রমণীর অভাব না হইবে, ততদিন আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। ভগবান্ ফের আবার আমাদের হিন্দুর ঘরে ঘরে, আমাদের অভাগা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই সর্ব্বগুণসম্পন্না গৃহলক্ষ্মী পাঠাইয়া দিন। প্রভু! অন্য আর কিছু চাহি না,—ধন চাহি না, মান চাহি না, যশের ফোয়ারা চাহি না। চাহি কেবল সদ্‌গুণ-সম্পন্না, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, স্বল্পে সন্তুষ্টা, দু'টি মিষ্ট কথায় হৃষ্টা, নিজ স্বামী

প্রেমে বিমুগ্ধা, পুত্রকন্যা সম্পদে পরিতুষ্টা, রন্ধনশালায় পাঞ্চালী, স্বামী-প্রেমের কাঙ্গালী, আমাদের সংসার গেহের দেবী— সর্ব্বসুখপ্রদাত্রী। আমাদের গৃহে গৃহে এইরূপ রমণী। আমরা আপনার নাম গাহিব আর সব দুঃখ ভুলিয়া যাইব।

"এস, মা মেনকারাণী, তুমি সর্ব্বগৃহে উদিত হও। সকল গৃহে প্রেম আন, সকল গৃহে ধর্ম্ম আন, সকল গৃহে কর্ম্ম আন, সকল গৃহে শান্তি আন, সকল গৃহে বিমল আনন্দ আন, সকল গৃহে নিরবচ্ছিন্ন সুখ আন। আবার বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে হাসি আন, আবার বাঙ্গলা হাসুক, আবার বাঙ্গলার ঈর্ষা দ্বেষ সরিয়া যাউক, আবার বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা উঠুক, আবার বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আনন্দসুধা বর্ষিত হউক। তুমি যেথানে, সেথানে দ্বেষ হিংসা থাকিতে পারে না; তুমি যেথানে, দাম্ভিকতা ও ভণ্ডতা সেথানে জন্মে না; তুমি যেথানে, সেথানে কুটিলতা, কলহপ্রিয়তা আসিতে পারে না; তুমি যেথানে, সেথানে অলসতা ও নিষ্ফল বাক্‌চতুরতা বিকাশ পায় না। তুমি নিষ্কাম প্রেম জান, কর্ম্ম জান, কর্ত্তব্য জান, আর সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানকে জান। তোমার কাছে নিষ্কাম প্রেমের জয়; আর তুমি নিঃস্বার্থ প্রেমে সকল জয় কর।"

সমাপ্ত

গ্রন্থকার লিখিত "ভোলানাথের ভুল" সম্বন্ধে কতিপয় সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকার মতামত

"ভোলানাথের ভুল" রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুর লিখিত উপন্যাস আকারে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ ধর্ম্মহীন, অর্থ সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর সমাজ ও সংসারচিত্র। ধর্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী কিরূপ অর্থদাস হইয়া পড়িতেছে, কিরূপ শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রবৎ অর্থ লোলুপ হইয়া পড়িতেছে, ধর্ম্ম ভুলিতেছে, ভগবান ভুলিতেছে, পরকাল ভুলিতেছে, এমন কি নিত্য প্রত্যক্ষ সকলের যে মৃত্যু, তাহাও নিজের পক্ষে যে একদিন অবশ্যম্ভাবী, তাহা পর্য্যন্ত ভাবিবার সময় না পাইয়া, কিরূপে কেবল টাকা টাকা করিয়া টা টা করিয়া বেড়াইতেছে, ধর্ম্ম যাউক, ন্যায় যাউক, চরিত্র যাউক, নাম যাউক, মান যাউক, পিতা যাউক, মাতা যাউক, ভ্রাতা যাউক সব যাউক, কেবল আমি "তিনি" আর আমাদের দুইজনের চারাগুলি থাকুক, আর আসুক কেবল টাকা আর টাকা, যেন তেন প্রকারেণ টাকা আসা চাই, সব সুখ ঐ টাকায়। আর কোথাও কিছু সুখ নাই, কোথাও কিছু শান্তি নাই, একমাত্র সুখ একমাত্র শান্তি ঐ টাকায়, টাকার দরকার অদরকার নাই, টাকার জন্যই টাকা, টাকার লোভের নিবৃত্তি নাই, যযাতির যৌবন স্পৃহার ন্যায় এই অর্থ স্পৃহা অনাদি অনন্ত, জাল করিয়া হউক, জুয়াচুরি করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, ডাকাতী করিয়া হউক, খুন করিয়া হউক, ঠকাইয়া হউক, যে করিয়াই হউক, টাকা হইলেই হইল। অনেকে যে টাকা টাকা করে, অথচ ঐ সকল জাল জুয়াচুরী

করে না তাহার অর্থ ইহা নয় যে, তাহারা সকলেই ধর্ম্মভয়ে ঐ সকল করে না। জেল বাঁচাইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকের করিবার সামর্থ্য বা সাহস নাই বলিয়াই, তাহারা বক-ধার্ম্মিক সাজিয়া ঐ সকল পাপ কার্য্য করে না বলিয়া প্রচার করে। মোট কথা ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে দেশময় এই যে নাস্তিক্য ভাবের প্রাবল্য হইয়াছে, যাহার ফলে লোকে ইহকাল-সর্ব্বস্ব ও টাকা-সর্ব্বস্ব হইয়া অসুরে পরিণত হইতেছে, তাহারই নিখুঁৎ প্রত্যক্ষ চিত্র তারক বাবু অতি মুন্সিয়ানার সহিত এই গ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন।

*   *   *   *   *

তারক বাবু পঁচিশ বৎসর কাল এই সকল পাপীদের × × × পাপকাণ্ড ঘাটিয়া মোট এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলেই এই সকল লোক এই রকম টাকা-পাপী হইয়াছে। আর একটি এই সিদ্ধান্তে তিনি আসিয়াছেন যে, টাকায় প্রকৃত সুখ নাই, সুখ মনে, মনের সুখ কখন অধর্ম্মার্জ্জিত টাকায় হইতে পারে না, ধর্ম্মার্জ্জিত শাকান্নেও মনে ও সংসারে সুখশান্তি থাকে, কিন্তু অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থে অট্টালিকায় বাস মোটরাদি বিহার প্রভৃতি কিছুতেই মনের সুখ শান্তি থাকে না। তিনি প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়াছেন, অধর্ম্মে বড়লোক হইয়া কেহ শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই, আর ধর্ম্মের টাকা শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া সংসারের সুখ শান্তি সবই দিয়াছে, বংশানুক্রমে বংশে কেহ পাপ না করা পর্য্যন্ত, ঐ ঐশ্বর্য্যে ভোগ হইয়াছে। এই সকলের মূল তারক বাবু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের আজকালকার ধর্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষা।

*   *   *   *   *

রাতারাতি বড়মানুষ হইবার লোভে পড়িয়া এই সকল পাপ পথে ধর্ম্মহীন অনেক বাঙ্গালী চলিতে গিয়া শেষে কি রকম পড়া পড়ে, তাহা এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত। ইউরোপের অনেক জুয়াচোর মহিলার

ন্যায় বাঙ্গালার অনেক গৃহলক্ষ্মী পর্য্যন্ত কি রকম টাকা টাকা করিয়া পিশাচী হইয়াছে, তাহাও এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

* * * * *

গ্রন্থকারের বাহাদুরী এই যে, তিনি এমন সকল পাপ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এমন কি বেশ্যা বাড়ীর দৃশ্য পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেখাইতে হইয়াছে, কিন্তু কোথাও অশ্লীলতার গন্ধ বাহির হয় নাই, সে সব যথাসম্ভব ঢাকিয়া চাপিয়া লিখিয়াছেন। অবশ্য গ্রন্থকার এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ অর্থ-পাপই দেখাইয়াছেন, কাম-পাপ মুখ্যতঃ দেখান নাই। তারক বাবু এই গ্রন্থে কলিকাতা হাইকোর্টের সেসনে উকীলদের পক্ষ সমর্থনে বাধার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। হাইকোর্টের সেসন হাইকোর্টের আদিম বিভাগের অন্তর্গত। হাইকোর্টের আদিম বিভাগ যত দিন ব্যারিষ্টারদের জন্য এক চেটিয়া থাকিবে ততদিন হাইকোর্ট সেসনের এই উকীল বাধা যাইবে না। তবে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ব্যারিষ্টারদের এই একচেটিয়াত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইতেছে, আশা হয় কালে কলিকাতা হাইকোর্টের এই পক্ষপাতমূলক বিসদৃশ ব্যবস্থা দূর হইবে। আমরা এই গ্রন্থ পড়িয়া খুসী হইয়াছি, আশা করি তারক বাবু এইরূপে মাতৃ সাহিত্য সেবা করিয়া দেশের উপকার করিবেন।

বঙ্গবাসী—২৯শে বৈশাখ ১৩৩০ সাল

* * * * *

× × × × "আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর কলিকাতা পুলিশ আদালতের পাব্লিক প্রসিকিউটার—উকিলসরকার। ওকালতির খাতিরে তাঁহাকে প্রত্যহ শত শত দুর্ব্বৃত্তের সংস্রবে আসিতে হইয়াছে; অনেকে স্বীয় পাপপূর্ণ জীবনের কাহিনী তাঁহার কাছে, সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া তারকবাবু যে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই উপন্যাস আকারে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তককে আমরা কেবল উপন্যাস বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি না, ইহ কে একাধারে উপন্যাস, ডিটিকটিভের গল্প ও নীতি-পুস্তক বলিতে পারা যায়। গ্রন্থের নায়ক ভোলানাথ সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান হইয়াও বুদ্ধির দোষে ও সঙ্গদোষে কিরূপ পিচ্ছল পাপ পথে পদার্পণ পূর্ব্বক অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া অবশেষে কারাগারে স্বীয় ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, লেখক তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

× × × পুস্তকখানি সময়োপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সকলেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন, কলিকাতায় কতপ্রকার জুয়াচুরী হইতেছে তাহা জানিয়া সাবধান হইতে পারিবেন। পুস্তকখানির বাঁধাই ও ছাপাও বেশ সুন্দর হইয়াছে।"

হিতবাদী—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ সাল।

"রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুরের লিখিত "ভোলানাথের ভুল" উপন্যাস-খানি সত্যই বেশ হইয়াছে। অনেকদিন পরে একখানা মৌলিক উপন্যাস পাঠ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম। ইহা অনুবাদ নহে, ছায়া অবলম্বনে লিখিত নহে, কায়া অবলম্বনে সাজান ফুলের সাজী নহে, ইহা দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ফল। ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। এ পুস্তক একখানা খরিদ করিয়া পড়িবে, খরিদের সামর্থ্য না থাকিলে তারকনাথের গৃহে যাইয়া চুরি বা ডাকাতী করিয়া আনিবে। আসল কথা যেমন করিয়া পার বইখানি পড়িয়া দেখ।"

নায়ক—৬ই চৈত্র ১৩২৯

* * * * *

"পুলিস কোর্টের উকীল রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর পরিণত বয়সে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "ভোলানাথের ভুল" একখানি গল্পের বই। রায় বাহাদুর দীর্ঘকাল বালহারাজীবের ব্যবসায়ে

নিযুক্ত থাকিয়া যে নানা চরিত্রের লোকের সংস্রবে আসিয়াছেন এবং তাহাতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই চিত্র তাঁহার এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ ধর্ম্মহীন শিক্ষার দোষে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে দেশবাসীদিগের মনে যে সকল দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার তৃপ্তি সাধন না হওয়ায় দুর্নীতি যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, গ্রন্থকার তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে যেমন আমোদ পাওয়া যায় তেমনই সুশিক্ষাও লাভ করা যায়। গ্রন্থখানি বালক যুবা বা বৃদ্ধ সকলেই এক সঙ্গে বসিয়া পড়িতে পারিবেন। ইহাতে কুরুচি বা অশ্লীলতার চিহ্নমাত্র নাই।” **দৈনিক বসুমতী**—১১ই শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল।

* * * * *

“এখানি উপন্যাস। লেখক প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, এক্ষণে কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর। ২৫ বৎসরকাল তিনি পুলিশকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। নানাচরিত্রের লোক তিনি দেখিতেছেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফলে অর্থাৎ এই ২৫ বৎসর ধরিয়া যাহা দেখিয়াছেন “সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে” তাহাই আজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ উপন্যাসে লেখক প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন “পাপলব্ধ অর্থ কেহ কখনও ভোগ করিতে পারে না। ইহা আনিতে দুঃখ, রাখিতে দুঃখ, পাইতে দুঃখ। লেখকের রচনায় প্রাণ আছে, ভাষা সরল, অনাড়ম্বর কোথাও বাহুল্য বা ফেনান নাই। চরিত্রগুলি স্ব স্ব বিশেষত্বে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বেশ ফুটিয়াছে। চরিত্রগুলির নাম করণেও লেখকের কৃতিত্ব চমৎকার। ভোলানাথ “একনম্বরের ঠক্; ছেলেবেলা হইতেই তার মনের গতি স্বার্থ-সিদ্ধির পথে চলিয়াছে এবং এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে না করিয়াছে, এমন কাজ নাই। হয় তো সে শুধরাইতে পারিত যদি একটি ভালো স্ত্রী লাভ

করিত। কিন্তু তাহা ঘটিল না। সংসারের নিয়মই এই। তার স্ত্রী ধূমাবতী নামের সার্থকতা রাখিয়াছে। সমস্ত সুপ্রবৃত্তিই সে ধূমাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। তার পুত্র রাহুরাম বাপ্‌কা বেটা। ভোলানাথের বন্ধু গুহকুমার সত্যই দুর্গ্রহ। অর্থাৎ সঙ্গী ও ঘটনা বদ্‌লোকের চরিত্রকে যে পথে সাধারণতঃ লইয়া যায়, ভোলানাথের জীবন পথে তেমনি সঙ্গী ও তেমনি ঘটনাই জুটিয়াছিল। ভোলানাথের দুর্ব্বল পিতা রাধানাথ, সঙ্কীর্ণমনা মাতা কাদম্বরী সমস্ত চরিত্রই বেশ গোটা জীবন্তমূর্ত্তিতে ফুটিয়াছে। আর ফুটিয়াছে তুলির অল্প টানে বারাঙ্গনা রায় বাঘিনী ও তার চার কন্যা + +

এ উপন্যাসে সমাজের কয়েকটা দুষ্ট ব্যাধি বিশ্লেষণ করিয়া লেখক সকলের চোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সে ব্যাধির উৎপত্তি হয় কি করিয়া, তাহার ধারাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন—লিমিটেড কোম্পানী যার তার হাতে লোক ঠকাইবার কি অস্ত্রই যে বনিয়া উঠে, সেয়ার মার্কেটে মানুষের কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহার চিত্রও সকলে দেখিয়া সতর্ক হইতে পারিবেন।

আশাকরি লেখক এইখানেই তাঁর লেখনীকে বিরাম দিবেন না; আরো বহু অমঙ্গলের পর্দ্দা তুলিয়া তিনি সমাজের লোকের সামনে সেগুলাকে ধরিয়া দিবেন। সমাজ তাহাতে উপকৃত হইবে। বহিখানির ছাপা—কাগজ—চমৎকার হইয়াছে।" ভারতী—চৈত্র ১৩২৯ সাল।

"রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়কে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বিস্মিত হইবেন যে, এই সম্পূর্ণ অনবসর ভদ্রলোক উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নাই; বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিবার বাসনা প্রথম যৌবন হইতেই তাঁহার ছিল, এ কথা আমরা জানি; এত দিনে সে বাসনা ফলবতী হইল। "ভোলানাথের ভুল" সাধু মহাশয়ের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রসূত; তাঁহাকে প্রতিদিন নানা শ্রেণীর অপরাধীর সংস্পর্শে আসিতে হয়; তিনি সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই ভুলের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা সর্ব্বাংশে

তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে ; আমরা এই গ্রন্থের বৈচিত্র্য-দর্শনে আনন্দিত হইয়াছি। বইখানি আদর লাভ করিবে ; সাধু মহাশয় অতঃপর আরও লিখিবেন এ আশা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।

"সাধু মহাশয়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক নহে। সমাজে অহরহঃ যাহারা মুখোস পরিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে, সাধু মহাশয় তাহাদের মুখোস টানিয়া, মুখের রঙ্ পাউডার মুছিয়া দিয়া তাহাদের প্রকৃত সত্তাটাকে লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাই সমস্ত পুস্তকখানা একটানে নিঃশেষ করিয়া পাঠকের মনে হয় "তাইত এ যে পরিচিত লোকের সমাবেশ অথচ এগুলোকে আগে তো ঠিক্ চিনি নাই।" × × ×

আমাদের যথেষ্ট আশা আছে যে, তারকনাথ বাবুর এই অভিনব গ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবে, এবং ইহার জ্বলন্ত চিত্রে সমাজের চোখ ফুটিবে। তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস পাঠ করিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।" অর্চ্চনা—বৈশাখ ১৩৩০ সাল।

* * * * *

"এই উপন্যাস প্লাবিত দেশে, প্রত্যহ নূতন উপন্যাস প্রকাশের মধ্যে এখানিও একখানি নূতন ধরণের, নূতন ছাঁচে ঢালা উপন্যাস।......বইখানি কাল্পনিক উপন্যাস নহে, ইহাতে প্রেমিক প্রেমিকার ভাল বাসা নাই, প্রেম নাই, ইহাতে ভাষার বিকট বদন ব্যদান করা নাই, আড়ম্বরের বিভীষিকা নাই, বাহুল্যতার প্রাচুর্য্য নাই। অথচ সব আছে, আজ কাল সমাজে প্রত্যহ চোখের সামনে যাহা ঘটিতেছে যাহার প্রভাবে কতশত লোক কিরূপে ঠকিতেছে, কত বড় বড় সংসার কেমন করিয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, হাজার হাজার ধনী ও মানীর সন্তান কেমনে পথে বসিতেছে, কত চরিত্রের লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতরকম মূর্ত্তিতে সমাজে প্রকট হইতেছে, তাহাই লেখক তাঁর পঁচিশ বৎসর কাল কলিকাতার পুলিশ কোর্টে প্রাণপাত পরিশ্রমের

ফলে যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাই সমাজের মঙ্গলের জন্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। লেখক বিদ্যাশিক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মশিক্ষার সহিত বিদ্যাশিক্ষা আর একটী অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা। এই দুইটি শিক্ষার কি ফল তাহাই উপন্যাসে বেশ ভালরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা অর্থ তাহার ফল কত মিষ্ট, কত আস্বাদপূর্ণ, কত সুখের ও শান্তির, আর পাপলব্ধ অর্থের ফল কত তীব্র, কত তিক্ত, কত অসুখের ও অশান্তিপূর্ণ তাহাই লেখক প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছেন। উপন্যাসের কাহিনীটী সুখপাঠ্য, ভাষা অতি সরল, রচনায় প্রাণ আছে। লেখার কৃতিত্ব অতি চমৎকার। চরিত্রগুলি যে যার চরিত্র লইয়া বেশ ফুটিয়াছে।

পাপ সংসর্গে, কুশিক্ষার ফলে পিতা রাধানাথের দুর্ব্বল চিত্তের ও অশিক্ষিতা সঙ্কীর্ণমনা মাতা কাদম্বরীর গুণে ভোলানাথের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল এবং এই সংস্পর্শে লিমিটেড কোম্পানীর ঠকবাজী, সেয়ার মার্কেটের খেলা, জুয়াচোরের আড্ডা— রাতারাতি বড়লোক করিবার ঘর, বারাঙ্গনাদের ছলচাতুরী প্রভৃতি যেরূপভাবে লেখকের তুলিকায় জীবন্ত মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সমাজের সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় ধরিয়া দিয়াছেন। ইহার জন্য সমাজ তাঁর নিকট চির উপকৃত হইয়া থাকিবে।

এইরূপ নূতন ভাবের উপন্যাস আজকাল অতি বিরল। যদিও রায় বাহাদুর এই পথের নবীন পথিক, তথাপি বইখানি, অতি সুখপাঠ্য, অতি সুন্দর, অতি সরল।

আমাদের স্থির বিশ্বাস এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকেরই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইবে। × × × × তাঁহার মত কৃতী ও মনস্বী ব্যক্তি যে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা বাস্তবিকই বড় আশার কথা। স্কুল কলেজে যাহাতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রচলন হয়, তাহার জন্য

গ্রন্থকার প্রাণের আবেগ প্রদর্শন করিয়াছেন। শিক্ষা পরিচালকগণের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। যে দেশে শিক্ষা ব্যাপারে ভগবানের স্থান আদৌ নাই, তথায় অধর্ম্ম ও দুর্নীতির প্রসার যে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

স্বরাজ—১৬শে জ্যৈষ্ঠ—১৩৩০ সাল।

BHOLANATH-ER BHOOL.

By Rai Tarak Nath Sadhu Bahadur. Published by Messrs Gurudas Chatterjee & Sons, 203-1-1, Cornwallis Street. Calcutta.

Rai Tarak Nath Sadhu Bahadur, B. L. Public Prosecutor of Calcutta, has written a novel in Bengali styled the "Bholanath-er Bhool." He has been a man of hard facts and a careful observer of man and things. In his concourse with that motley crowd—the distressed Humanity—that daily frequent the Calcutta Police Courts, he discerned how baneful has been the effect of the present system of education on our people and the great "mistake" that we daily commit in our lives and has graphically delineated it in the shape of a story in the volume under review.

The author has depicted the character of Bhola Nath as one who was brought up in an irreligious and godless atmosphere and who piled money by hook or crook and had no hesitation even to defraud his own kith and kin. His insensate desire for money made his activities criminal and he had ultimately to figure himself as an accused person in the criminal court and to pay a severe penalty there ; but, he however, realised late in life how disastrous had been his mad career of money-making due to his secular education. It is not so much the story or the moral thereof, but the rich and varied experience of the Rai Bahadur, of that unfortunate species of Humani-

ty—who being the victims of circumstances over which they have little or no control—have to frequent the police Court that commends itself to one. We have read with great interest of the description given by the Rai Bahadur of the "All-India Harinam Satya Co Ld.," of the "Share Market," of the various scenes behind the veil in the manipulation of cases, of the alleged 'dacoity' by Narendranath in the room of his father, of the erstwhile friend Graha Kumer falling out with Bholanath and paying him back in his own coin, of the shortcomings of trials in the Sessions of the Calcutta High Court and how accused persons are considerably hampered in their defence owing to the monopoly of the Barrister-at-Law, of the demoniacal life of Benodini and her 4 daughters and the fate of Rahuram at their hands.

* * * * * *

Amrita Bazar Patrika, 24 July 1923.